পাইরেটস’ ডেনের

মেছোবই

তৃতীয় সংখ্যা, ১৪২৯

সম্পাদক
অরিত্র ভট্টাচার্য্য

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সৌম্য সরকার, পবিত্র পাল, শুভদীপ দাস,
জ্যোতির্ময় রায়, সঞ্জীব পাত্র, অভীক ঘোষ

প্রচ্ছদ
অরিত্র ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক
অর্জন বসু রায়

মুদ্রণ
বর্ণনা প্রকাশনী
৬/৭, বিজয়গড় কলকাতা-৭০০০৩২
দূরভাষ: ৯৮৭৪৩৫৭৪১৪

সূচীপত্র

১. অ্যাকোয়ারিয়ামের শুরুর কথা - পবিত্র পাল।
২. উপমহাদেশীয় জলজ গাছ - অভীক ঘোষ।

৩. মাছের আঁকা, আঁকার মাছ - অরিত্র ভট্টাচার্য্য।
৪. জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনজাতির মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি - রাকেশ সিংহ দেব-
৫. বিশেষ আকর্ষণ - আগামীর মেছো।
৬. হ্যামিলটন বুকানন: ভারতীয় মাছের নামকরণের ইতিকথা - শ্রয়ণ ভট্টাচার্য।
৭. বায়োফ্লোক টেকনোলজি: মাছ চাষের এক নতুন উদ্ভাবনী আবিষ্কার - দেবায়ন চ্যাটার্জী।

৮. পুরান কথায় মৎস্য - অয়ন ঘোষ।

৯. অভিসারী বিবর্তন বা পৃথক যাত্রার এক পরিণাম - ঐশিক রায়।
১০. মাছের জলের TDS এবং Hardness-এর গোড়ার কথা- প্রসেনজিৎ খাঁ।।
১১. বিশেষ আকর্ষণ - মাছ-চিত্র।

১২. গাছুয়া গাথা - ইন্দ্রনীল মৈত্র।

১৩. পাঁচ ফোঁটা রত্নের সন্ধানে - সৌম্য সরকার
১৪. পাঠকের মেছো স্মৃতি:
ক) সিস্টোসারকা গ্রিগেরিয়া - বিদিশা ভট্টাচার্য্য
খ) নস্ট্যালজিয়া - তথ্যপ্রিয় দাস

মেছোবই

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪২৯

সম্পাদকের কথা

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে যখন ‘মেছোবই’ এর প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে বসি তখন মনে আশার সাথে সাথে একটা আশঙ্কাও ছিল যে ‘মেছোবই’ এর সম্পাদকীয় লেখার সুযোগ আর বেশী হবে কিনা! কিন্তু সূর্যদেব পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে নেওয়ার সাথে সাথে সেই আশঙ্কাও অনেকটাই মুছে গেছে। গত এক বছরে বেরোনো দুটি সংখ্যার নিরিখে দেখতে হলে ‘মেছোবই’ এখন হামাগুড়ি, টলোমলো হাঁটার পর্ব পেরিয়ে কিছুটা সাবালকত্বের পথে এগিয়েছে, মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সে এখন অনেকটাই সাবলীল। তবে একজন শিশু যেমন তার অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ীদের যত্ন, ভালোবাসা, আশীর্বাদ ছাড়া সঠিকভাবে বড়ো হয়ে উঠতে পারে না তেমনই ‘মেছোবই’ এই বড়ো হয়ে ওঠার পথে পেয়েছে “পাইরেটস ডেন” গ্রুপ এবং গ্রুপের বাইরের অগণিত প্রকৃতি ও মৎস্যপ্রেমী গুণীজনদের যত্ন ও ভালোবাসা। বিশেষ করে ‘মেছোবই’ এর পুজো সংখ্যার সাফল্য আমাদের আরো বেশী উৎসাহিত করেছে। “ আনন্দবাজার পত্রিকা”র মতো প্রথম সারির দৈনিকের পাতায় স্থান পাওয়া থেকে মধ্যমগ্রামের প্রথিতযশা শ্যামাপূজার মন্ডপসজ্জায় স্থান পাওয়া, এ সবই সেই সার্বিক ভালোবাসা, আশীর্বাদের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইতিমধ্যে আমরা তৈরী করে নিয়েছি আন্তর্জালিক দুনিয়ায় এক স্থায়ী আবাসন, আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইট www.piratesden.in যেখান থেকে মাছ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে সবসময় পাওয়া যাবে আমাদের এই নিজস্ব বাঙলা ভাষার প্রথম জলজ প্রকৃতি সংক্রান্ত ই-ম্যাগাজিন ‘মেছোবই’ এর প্রতিটি সংখ্যা। আর আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের গ্রুপ “পাইরেটস ডেন” ও আমাদের নিজস্ব ম্যাগাজিন ‘মেছোবই’ এর মূল উদ্দেশ্য যেহেতু জলজ প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানের মুক্ত আদানপ্রদান, তাই গত দুই সংখ্যার মতো এবারের ‘মেছোবই’ ও বিনামূল্যেই বিতরিত হবে। তবে এটা সহজেই অনুমেয় যে আমরা কোনও আর্থিক লাভের জন্য ম্যাগাজিন না বের করলেও এই ম্যাগাজিন প্রকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচের ঊর্দ্ধে আমরা কেউ-ই নই। আর আমরা ম্যাগাজিনের মান এবং বিষয়বস্তুর সাথে আপস না করার ফলে সেই খরচটা একটু বেশীর দিকেই থাকে। এখানেই আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের সমগ্র অনুদান ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে। তাঁরা আমাদের ওপর ভরসা করেন, করেছেন বলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রতিবার আলোর মুখ দেখে। তাই আমরা চাই আপনারা যদি এই ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য ও গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট হন তাহলে আপনাদের এই ভালোবাসার ম্যাগাজিনকে শেয়ার করে আরো ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে যাতে বিজ্ঞাপনদাতারা আরো একটু উৎসাহিত হয়ে আমাদের পাশে থাকতে পারেন, আমরাও আরো কিছুটা জোর পাই।। ‘মেছোবই’ এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে উৎসবমুখর বাঙালীর বছরের শুরুর, নববর্ষের উৎসবকে কেন্দ্র করে। পরিবেশ ও মৎস্যপ্রেমীজনেদের কাছে এই উৎসব আরো আলোকিত করে তুলতে ‘মেছোবই’ নিয়ে আসছে এক ডজন বিভিন্ন স্বাদের মাছ সম্পর্কিত লেখা যার মধ্যে কিছু গ্রুপে পূর্বে প্রকাশিত, পরিমার্জিত লেখা এবং কিছু সম্পূর্ণ নতুন লেখা। এর সাথে থাকছে আমাদের জনপ্রিয় দুটি বিভাগ, কচিকাঁচাদের পাতা ‘আগামীর মেছো’, আর বাঙলার প্রথম মাছ সংক্রান্ত কমিক্স ‘মাছ-চিত্র’। এইবার আপনাদের ভালোবাসায় যুক্ত হয়েছে আরো একটি বিভাগ ‘পাঠকের মেছো স্মৃতি’, যেখানে একাধিক হবিস্টরা তাঁদের মাছ পোষার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। সবমিলিয়ে আমাদের আশা এই নববর্ষ আরো রঙিন করে তুলবে আমাদের সবার ‘মেছোবই’। তবে আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টার শেষ বিচারক আপনারাই। আপনাদের ভালোলাগা, মন্দ লাগার কথা নির্দ্বিধায় জানান আমাদের কাছে ‘মেছোবই’ এর পাতায় দেওয়া যোগাযোগের মাধ্যমে। আমরা সবাই যাত্রী, যাত্রাপথের কুড়িয়ে নেওয়া অভিজ্ঞতাটুকুই আমাদের সম্বল। আর সেই সম্বলটুকুর ভরসাতেই আমরা একে অপরের হাত ধরে, ‘মেছোবই’ এর হাত ধরে এগিয়ে যেতে চাই এক সুন্দরতর পরিবেশের দিকে। আপনাদের বাড়ানো হাতের আশায় রইলাম আমরা সবাই। নববর্ষ সবার সুখে শান্তিতে, মাছে-বশে কাটুক।

অ্যাডমিন এবং মডারেটার, পাইরেটস ডেন।

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নং - 9903569935, 9333150179, 9679747900

NEST HOMES

Rest in your nest!

Contact us:
+916294924252/+919123362722

NEST

কর্মব্যস্ত জীবনে মনটা একটু পাহাড় পাহাড় করছে? কোনো চিন্তা না করেই নর্থ বেঙ্গল, সিকিম-এর যেকোনো জায়গায় ট্যুর প্ল্যানের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কাস্টমাইজড ট্রিপ, হোমস্টে বুকিং আর গাড়ি সমস্ত কিছুর একটাই ঠিকানা নেস্ট হোমস। প্যাকেজে ইনক্লুড থাকবে পিকাপ এবং ড্রপ, থাকা, খাওয়া, সমস্ত সাইটসিন। তাহলে আর না ভেবে তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে ফেলুন আর বেড়িয়ে পড়ুন।

আমরা তো রইলাম।

।। অ্যাকোয়ারিয়ামের শুরুর কথা ।।

পবিত্র পাল

ভাই অ্যাকোয়ারিয়াম করছিস? বিশাল খাটনি কিন্তু ভাই, সপ্তাহে সপ্তাহে জল পালটাতে হয়। মাছ বেশিদিন বাঁচে না রে, আমার পিসেমশাই করেছিল। টাকা নষ্ট, বেকার খাটনি। অ্যাকোয়ারিয়াম করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এসব মন্তব্য শুনেছেন নিশ্চয়ই? শুনে ঘাবড়ে গেছেন? ভাবছেন অ্যাকোয়ারিয়াম বানাবো কি বানাবো না? বানালে মাছ বাঁচাতে পারবো তো? যদি মরে যায়? এসব সাত-পাঁচ ভেবে ভেবে যদি কপালে ভাঁজ ফেলে থাকেন, তবে এই লেখা আপনার জন্য? বেশ, তবে এবার ভূমিকা-টুমিকা বাদ দিয়ে আসল কথায় আসি, বলুন তো মানুষ অ্যাকোয়ারিয়াম কেন করে? ভেবে দেখলে দেখবেন প্রধানত দুটো কারণে, এক সৌন্দর্য পছন্দ করে বলে, আর দুই মানুষ মুগ্ধ হতে ভালোবাসে বলে। যদি আপনার মধ্যে এই দুটো গুণ থাকে তবে আপনিও সফল হবেনই। এবার দেখি মেছো শখের জটিলতাগুলো বাদ দিয়ে কিভাবে শুরু করা যায়। একদম নতুনভাবে অ্যাকোয়ারিয়াম শুরু করতে গেলে একজন ইচ্ছুক ব্যাক্তির মনে কতগুলো প্রশ্ন জাগে, চলুন আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে দিতে এগোই।

(১) কতবড় অ্যাকোয়ারিয়াম করবো?

যত বড়ো আপনার ইচ্ছা, শুধুমাত্র খেয়াল রাখবেন বড় অ্যাকোয়ারিয়ামের কাঁচ যেন যথেষ্ট মোটা হয়, বড় অ্যাকোয়ারিয়াম মানেই বেশি জলের চাপ তাই শক্তিশালী আঠা ও মোটা কাঁচের অ্যাকোয়ারিয়াম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম করলে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়েই বানানো উচিত যাতে প্রাথমিক ভুলভ্রান্তি এড়ানো যায়। এবং সুন্দর ও টিকসই অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি হয়। তবে মনে রাখবেন সাধারণত অ্যাকোয়ারিয়ামের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অন্ততঃ দ্বিগুণ ও উচ্চতা প্রস্থের সমান বা সর্বোচ্চ দেড়গুন হলে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন হয়। ২'x১'x১', ৩'x১.৫'x১.৫' ইত্যাদি সাইজের অ্যাকোয়ারিয়াম নতুনদের পক্ষে সুবিধাজনক।

(২) অ্যাকোয়ারিয়াম কোথায় রাখবো, কিভাবে রাখবো?

অ্যাকোয়ারিয়াম একটি ভারী জিনিস, কাঁচ, জল, বালি-পাথর সবকিছু মিলিয়ে একটা ছোট ২'x১'x১' ছোট অ্যাকোয়ারিয়ামের ওজনই ১০০ কেজির কাছাকাছি চলে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে ছোট হোক বা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম রাখার জন্য শক্তপোক্ত কোন কাঠের টেবিল, আয়রন বা অ্যালুমিনিয়ামের স্ট্যান্ড বানিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। টেবিলের উপর অ্যাকোয়ারিয়াম বসানোর আগে মোটা থার্মোকল বিছিয়ে নেওয়া খুব জরুরি। থার্মোকল বসিয়ে তার উপর ট্যাঙ্ক বসাতে হয়। এরপর দেখতে হবে অ্যাকোয়ারিয়াম বসানোর পর যেন অ্যাকোয়ারিয়াম সহ টেবিলটি একদম stable থাকে, উঁচুনিচু না থাকে বা নড়াচড়া না করে। জলের তল অ্যাকোয়ারিয়ামের চারিপাশে সমান থাকে। নচেৎ কাঁচের একদিকে বেশি জলের চাপ পড়লে অ্যাকোয়ারিয়াম ফেটে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অ্যাকোয়ারিয়াম রাখা উচিত বাড়ির সবচেয়ে নিরিবিলি অংশে, যেখানে মাছেরা মানুষের গতিবিধি, যান্ত্রিক শব্দ, কম্পন ইত্যাদি দ্বারা সবচেয়ে কম প্রভাবিত হবে। সাধারণত বাড়ির বারান্দা, ঘরের কোন, সিঁড়ির নীচ, বেসমেন্ট ইত্যাদি জায়গা অ্যাকোয়ারিয়াম রাখার জন্য আদর্শ। তবে সাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে তীব্র রোদ, ঝড়বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টির প্রকোপ পড়তে পারে এমন জায়গায় কখনোই অ্যাকোয়ারিয়াম রাখা উচিত নয়।

(৩) অ্যাকোয়ারিয়ামে কি সাবস্ট্রেট ব্যবহার করবো?

আজকাল বাজারে অনেক ধরনের কৃত্রিম বালি পাথর পাওয়া যায়, সেগুলোর কতগুলো নির্দিষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা আছে, দেখতে সুন্দর হলেও সেগুলো থেকে রং ওঠা, কাঁচের গায়ে দাগ পড়ে যাওয়া, জলের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর পরিবর্তন করার মতো সমস্যা দেখা যায়। তাই শুরুতেই লাল-নীল পাথরের মোহ ত্যাগ করে সাধারণ বাড়ি তৈরির মোটা বালি (কনস্ট্রাকশনের

স্যান্ড), বালি চালা নুড়ি বা অন্য কোন নদীর বালি-পাথর সংগ্রহ করে ব্যবহার করা ভালো, এতে সাবস্ট্রেট থেকে জল দুষিত হয়ে মাছ মরে যাওয়ার প্রাথমিক ঝুঁকি অনেক কমে যায়, পয়সাও সাশ্রয় হয়।। তবে যে ধরনের নুড়ি-বালি ব্যবহার করুন না কেন বারবার ভালোভাবে ধুয়ে ধুয়ে আবর্জনা একেবারে বের করে দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। অ্যাকোয়ারিয়ামে ব্যবহারের আগে যে কোন সাবস্ট্রেট কে অন্ততঃ ৭-১০ দিন আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রেখে তারপর পরিস্কার করে ধুয়ে ব্যবহার করা উচিত। অ্যাকোয়ারিয়ামে সাবস্ট্রেট মাছ-গাছ-উপকারী ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদির জন্য একটি প্রধান ভিত্তি। তাই একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে কমপক্ষে এক ইঞ্চি পুরু সাবস্ট্রেট খুব জরুরি।

(৪) কি ধরনের ফিল্টার লাগানো উচিত?

ফিল্টার অ্যাকোয়ারিয়ামের মেরুদন্ড। ভালো ফিল্টার না হলে কখনোই ভালো অ্যাকোয়ারিয়াম করা সম্ভব নয়। ফিল্টার একদিকে যেমন মাছের বর্জ্য পদার্থ পরিস্কার করে মেকানিক্যাল ফিলট্রেশনে সাহায্য করে, তেমনি জৈব পদার্থ বিয়োজনে সাহায্য করে বায়োলজিক্যাল ফিলট্রেশনও করে। ফিল্টারের মধ্যে থাকা মিডিয়ায় উপকারী ব্যাক্টেরিয়া সবচেয়ে বেশি বাসা বাঁধে, এবং এই ব্যাক্টেরিয়ারাই অ্যাকোয়ারিয়ামের বর্জ্য বিয়োজনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই এই উপকারী ব্যাক্টেরিয়াদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে অ্যাকোয়ারিয়ামে ফিল্টার কখনোই বন্ধ করা উচিত নয়। সাধারণত বাজারে ইন্টারনাল ফিল্টার (যাঁদের ফিল্টার মিডিয়া অ্যাকোয়ারিয়ামের জলের মধ্যে থাকে; যেমন, Power filter, Sponge filter, Corner filter, Bio-sponge filter ইত্যাদি) ও এক্সটার্নাল ফিল্টার (যাঁদের ফিল্টার মিডিয়া অ্যাকোয়ারিয়ামের জলের বাইরে থাকে; যেমন, Top filter, Hang on back filter, Sump filter, Canister filter ইত্যাদি) এই দুই ধরনের ফিল্টার কিনতে পাওয়া যায়। অ্যাকোয়ারিয়ামের সাইজ, মাছের সংখ্যা, মাছের প্রকৃতি ইত্যাদি বিচার করে প্রয়োজন অনুযায়ী ফিল্টার লাগানো উচিত। যেসব মাছেরা স্রোত পছন্দ করে না তাদের ক্ষেত্রে কখনোই শক্তিশালী পাওয়ার হেড যুক্ত ফিল্টার লাগানো উচিত নয়।

নানান রকমের ফিল্টার, অ্যাকোয়ারিয়াম হবির গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী

(৫) অ্যাকোয়ারিয়ামে আলোর কি প্রয়োজন?

আলো ছাড়া যে কোন অ্যাকোয়ারিয়াম নিষ্প্রাণ। অ্যাকোয়ারিয়ামের সৌন্দর্য আলোর উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। তাছাড়া বহু মাছেদের অন্ধকারে রাখলে যেমন তাদের রং ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে, আবার অতি তীব্র আলোও মাছেদের স্ট্রেস বৃদ্ধি করে নানানরকম সমস্যা তৈরি করে। তাই সাধারণ স্নিগ্ধ সাদা আলো অ্যাকোয়ারিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি সহ মাছ ও গাছপালার বৃদ্ধি বিকাশে সবচেয়ে উপযুক্ত। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যারা অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গাছপালা রাখতে চান বা শুধুই গাছপালা ভর্তি প্ল্যান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম করতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে আলোর চাহিদা সম্পূর্ণ আলাদা। এই লেখায় সেই আলো নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবুও যদি সাধারণ কিছু কষ্ট সহিষ্ণু গাছপালা অ্যাকোয়ারিয়ামে করতে চান, সেক্ষেত্রে বাজারে সামান্য বাজেটেই কিছু LED বাল্ব, টিউব, SMD জাতীয় ভালো আলো পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করে 'দু-চারটে গাছ, কিছু মাছ' অবশ্যই করা যায়। তবে যে আলোই ব্যবহার করুন সাদা আলো ছাড়া অন্য কোন আলো সাধারণ অ্যাকোয়ারিয়ামে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষত লাল-নীল ডিস্কো আলো তো মোটেই নয়। এতে মাছের ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন আশা নেই।

(৬) অ্যাকোয়ারিয়ামে কিছু কষ্টসহিষ্ণু গাছপালা কি উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া বাঁচানো যেতে পারে?

নিশ্চয়ই পারে, ভ্যালিসনেরিয়া, কাবম্বা, ইলোডিয়া, হাইগ্রোফিলা, লিলি, অ্যাপোনোগেটন, রোটালা, ফ্রগবিট জাতীয় গাছপালা সহজেই বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হবে যেমন -

ক) তীব্র আলো দরকার। নূন্যতম T5 LED Tube বা বাল্ব দরকার হবে। উদাহরণ হিসেবে একটি ২'x১'x১' ট্যাঙ্কের জন্য নূন্যতম দুটি T5 লাইট দরকার পড়বে।

খ) যদি ধরে নেওয়া হয় আলাদা করে কোন ফার্টিলাইজার বা কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া হবে না, সেক্ষেত্রে গাছপালা প্রাথমিকভাবে অ্যাকোয়ারিয়ামের জল ও সাবস্ট্রেট থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবে। সেক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ ৪০-৫০% জল পরিবর্তন দরকার হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো মাছের বর্জ্য গাছ খায় জাতীয় ধারণা মাথায় না রেখে চলাই ভালো। গাছেরা মূলত জল ও সাবস্ট্রেট থেকে মৌলিক পদার্থ সংগ্রহ করে আলোর সাহায্য সালোকসংশ্লেষ করে খাদ্যের চাহিদা মেটায়।

গ) গাছপালা একবার লাগানোর পর গোড়া উপড়ে তোলা যাবে না।

ঘ) গাছপালা লাগানোর জন্য অবশ্যই বালি জাতীয় কোন সাবস্ট্রেট ব্যবহার করতে হবে। পাথর বা নুড়িতে গাছপালা না লাগানোই ভালো।

ঙ) গাছ পুঁতে পরদিনই মাছ ছাড়া যাবে না, নূন্যতম তিন থেকে চার সপ্তাহ গাছ লেগে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই সময় গাছ শিকড় ছেড়ে সাবস্ট্রেট আঁকড়ে ধরলে তারপর মাছ ছাড়তে হবে।

চ) ট্যাঙ্কের সাইজ অনুযায়ী স্রোতযুক্ত ফিল্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। (এতটাও স্রোত নয় যে গাছপালা উপড়ে চলে আসে)

ছ) দিনে নূন্যতম ৭-৮ ঘন্টা একটানা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

(৭) অ্যাকোয়ারিয়ামের জল কিভাবে তৈরি করবো?

অ্যাকোয়ারিয়ামে জল থাকে, আর জলেই মাছ থাকে, জলের উপরেই মাছের জীবন-মৃত্যু অনেকটাই নির্ভর করে। অ্যাকোয়ারিয়াম করার আগে কেমন মাছ করবো, তাঁরা কেমন ধরনের জলে থাকে এই বিষয়টিকে তাই গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। কথায় বলতে সবই মিষ্টি জল কিন্তু তাদের মধ্যে আসলে বিস্তর পার্থক্য। কোনো কোনো জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ কম, কোথাও বেশি, কোথাও জলের আম্লিকতা বেশি তো কোথাও ক্ষারত্ব বেশি। কেউ স্বচ্ছ জলের বাসিন্দা, আবার কেউ কালচে বাদামী রঙের জলে থাকতে পছন্দ করে। এসবের উপর নির্ভর করে প্রতিটি অ্যাকোয়ারিয়ামে আলাদা আলাদা ধরনের মাছের জন্য আলাদা আলাদা রকমের জলের প্রয়োজন হয়। ধরুন কেউ আফ্রিকান হ্রদের সিকলিড মাছ পুষতে চান, তবে তাকে ঐ মাছ রাখতে হলে ঐ হ্রদের মতো জল তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ জলের TDS (Total Dissolved Solids) এর মাত্রা বেশি রাখতে হবে, এবং সেইসাথে pH এর মাত্রাও বেশি রাখতে হবে। আবার যদি কেউ মনে করেন ঐ ট্যাঙ্কেই অস্কার বা সেভেরাম

পুষবেন তবে কিন্তু হবে না, কারণ অস্কার, সেভেরাম বা অধিকাংশ দক্ষিণ আমেরিকার মাছেরা যে জলে থাকতে পছন্দ করে তাঁর pH এর মান ৬.৫ এর নীচে এবং TDS ১৫০ এর কম। অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম pH যা জলের অম্লতা ও ক্ষারকীয়তা নির্দেশ করে এবং TDS যা জলের দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের মাত্রা নির্দেশ করে তা জল তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও আরো বড় কতগুলি বিষয় হচ্ছে জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, নাইট্রেট, দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) ইত্যাদির পরিমাণ। তবে সেগুলো নির্ধারণের জন্য বাজারে টেস্টিং কিট কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করে জলে উপরিউক্ত জৈব রাসায়নিকের উপস্থিতি নির্ণয় করে নেওয়া যায়।

(৮) অ্যাকোয়ারিয়ামে জল ভরলেই কি মাছ রাখা যাবে?

যাবে না। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না ট্যাঙ্ক সাইকেল হচ্ছে। অর্থাৎ ট্যাঙ্কে উৎপাদিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ (ট্যাঙ্কে দেওয়া কাঠ-বালি-পাথর ইত্যাদি থেকে লিচিং এর ফলে জলে মিশতে থাকা পদার্থ) বিয়োজিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপকারী ব্যাক্টেরিয়া কলোনি ট্যাঙ্কের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই সময় আপনাকে ফিল্টার আলো ইত্যাদি চালিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ফিল্টার কখনো বন্ধ করা যায় না, ২৪x৭ ফিল্টার চালাতে হয়। এতে যেমন ট্যাঙ্কের জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সুষম অবস্থায় থাকে তেমনি ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা বায়োলজিক্যাল ফিলট্রেশনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এর ফলে ট্যাঙ্কের পরিবেশে হঠাৎ কোন বড়সড় পরিবর্তন হয় না। এভাবে দিন পনেরো থেকে একমাস চলার পর ট্যাঙ্কটি মাছের বসবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। খেয়াল করলে দেখা যায় এই সময় থেকে ট্যাঙ্কে অ্যালগি জন্মাতে শুরু করে, ট্যাঙ্কের জল একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে অল্প সংখ্যক মাছ রাখতে শুরু করা যায়।

(৯) কি মাছ রাখতে পারি, কতগুলো রাখতে পারি?

শুরুতে আমাদের সবার মনে হয় কি মাছ রাখতে পারি না, যে মাছ দেখি সেটাই ভালো লাগে এবং রাখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে সব মাছ একসাথে রাখা যায় না, একসাথে পোষা যায় না। অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানে একসাথে বিক্রি হচ্ছে মানেই একসাথে রাখা যাবে এরকম কোন কথা নেই। ফলে মাছ ভালো লাগতেই পারে, মনে হতেই পারে এই মাছটা না পুষতে পারলে আমার জীবন বৃথা, তবুও লোভ সংবরণ করতেই হবে। কারণ কোন মাছ পোষার আগে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়া ভালো। পড়াশোনা করে নেওয়া ভালো। কারণ আপনি পয়সা খরচ করে ভালো অ্যাকোয়ারিয়াম, ভালো ফিল্টার, পছন্দসই মাছ কিনতেই পারেন কিন্তু সেই মাছটা আপনি পুষতে পারবেন কি না, বাঁচাতে পারবেন কি না, সেগুলো নির্ভর করবে আপনার ঐ মাছ সম্পর্কে জ্ঞানের উপরে। তাই মাছ কেনার আগে পড়ুন, জানুন, হোম ওয়ার্ক করুন এবং দোকানদারের ২-৪ মিনিটের উপদেশের উপর নির্ভর না করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে মাছ কিনুন। এবং এক্ষেত্রে সঠিক পর্যায়ক্রম হচ্ছে আগে মাছ পছন্দ করুন, সেই মাছ কিভাবে কত সংখ্যায় রাখা যায় জানুন, তারপর তাদের রাখার জায়গা হিসেবে করে প্রয়োজন মতো ট্যাঙ্ক বানান, ট্যাঙ্কের সাইজ অনুযায়ী ফিলট্রেশন লাগিয়ে ট্যাঙ্ক সাইকেল করে তারপর শেষ ধাপে মাছ কিনে সেই মাছ রাখুন। স্থলভাগে যেমন বিভিন্ন জীবের খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তেমনি জলের নীচেও। বিভিন্ন মাংশাসী মাছেরা ছোট বড় শাকাহারী মাছেদের খেয়ে বেঁচে থাকে। এরাও জলের নিচে বাসা বানায়, ডিম-বাচ্চা প্রতিপালন করে, বাচ্চাদের রক্ষা করে, মিলনের ঋতুতে মারামারি করে। ফলে এই বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা না করে মাছ রাখলেই বিপদ। যেমন ধরুন আপনি রঙে মুগ্ধ হয়ে কোন শাকাহারী মাছ কিনে আনলেন কিন্তু তাদের খাবার সম্পর্কে বা কাদের সাথে রাখা যায় সে সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ নিলেন না, এক্ষেত্রে কিন্তু মাছটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়াও অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানে আমরা যে সব মাছকে বিক্রি হতে দেখি সেগুলো অধিকাংশই ছোট মাছ বা মাছের বাচ্চা। চারাগাছ দেখে না চিনলে যেমন আপনি বুঝতে পারবেন না চারাটি বড় হয়ে কত বড় মহীরুহ হবে মাছের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দোকানে বিক্রি হওয়া বহু ছোট মাছই প্রাপ্তবয়স্ক হলে দানবীয় চেহারা নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ মাছ সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে বড় হলে কতটা জায়গা লাগতে পারে সেই বুঝে বড় ট্যাঙ্ক তৈরি করে তারপর ছোট মাছ কেনা ভালো। অনেকেই হয়তো ভাবেন এখন মাছটা ছোট ছোট জায়গায় রাখি, বড় হলে দেখা যাবে, এটা অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি। ছোট জায়গায় মাছের বৃদ্ধি বিকাশ ব্যাহত হয়ে মাছটির নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা যেমন হতে পারে, তেমনি অকালমৃত্যুও কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই বন্ধু এক্ষেত্রে প্লিজ একটু ভেবে পা ফেলুন।

(১০) মাছের খাবার কি হবে? কতবার খেতে দেবো?

মাছেরা মুলত তিন প্রকার শাকাহারী, মাংশাসী ও সর্বভূক। অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানে আমরা যাদের বিক্রি হতে দেখি তাদের সিংহভাগই হয় মাংশাসী নয় সর্বভূক। ফলে খাওয়া দাওয়া নিয়ে খুব একটা সমস্যা হয় না। বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাছের জন্য ভালো মানের ভাসমান ও ডোবা খাবার পাওয়া যায়। প্যালেট, ফ্লেক, স্টিক ইত্যাদি ধরনের খাবার তো আছেই সাথে ফ্রোজেন এবং লাইভ খাবারও খুব সহজলভ্য। ফলে আজকাল মাছকে কি খাওয়াবো সেটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হয় না। একটু দাম দিয়ে ভালো ব্র্যান্ডের কোন খাবার খাওয়ালে সহজেই মাছকে ভালো রাখা যায়। তবে মূল বিষয়টা হচ্ছে কতোটা খাওয়াবো। মাছ দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে, আদর করতে পারি না বলে যখনই অ্যাকোয়ারিয়াম দেখি খেতে দিতে ইচ্ছা করে ভাবলে মাছ টিকিয়ে রাখা মুশকিল, কারণ যত মাছ না খেতে পেয়ে মরে তারচেয়ে বেশি মাছ অধিক খেয়ে মরে। তাই খাবার দিতে হবে খুব সাবধানে, পরিমাণে বেশি-কম কোনটাই হলে চলবে না, হতে হবে যথাযথ। যাতে মাছের পেট ভরে, বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় এবং অতিরিক্ত খাবার পড়েও না থাকে এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে। অ্যাকোয়ারিয়ামে অতিরিক্ত খাবার মানেই অ্যাকোয়ারিয়ামের পরিবেশ দূষিত হওয়া, যা কালক্রমে নানান ধরনের রোগ এবং মাছের মৃত্যু ডেকে আনে। তাই সচেতনভাবেই মাছের খাবার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত দিনে দুইবার (সকাল ও বিকাল বেলা) খেতে দেওয়া উচিত এবং মোটামুটিভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব খাবার খেয়ে নিতে পারে এরকম পরিমাণ খেতে দেওয়া উচিত। পাঁচ মিনিটের অনেক আগেই খেয়ে নিচ্ছে দেখলে বুঝতে হবে খাবারের পরিমাণ বাড়ানো দরকার, পাঁচ মিনিটের অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে মানেই খাবারের পরিমাণ কমাতে হবে। তবে খাবার কখনোই যেন অ্যাকোয়ারিয়ামে পড়ে না থাকে সেটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। অতিরিক্ত খাবার থাকলেই দ্রুত তুলে ফেলতে হবে।

(১১) ট্যাঙ্ক ব্যালেন্স কি?

ধরুন আপনি একটি সুন্দর বাড়ি বানালেন, কিন্তু ভালো বাথরুম তৈরি করলেন না, বা বাথরুম যদিও তৈরি হলো বাড়ির বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিকমতো হলো না, তবে কি আপনি সেই বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারবেন? পারবেন না,

কারণ ওই বাড়ির পরিবেশ খুব দ্রুত দূষিত হয়ে নানান রোগের আখড়া হয়ে উঠবে। ঠিক তেমনিই অ্যাকোয়ারিয়াম হচ্ছে সুন্দর বাড়ি, ফিল্টার হচ্ছে বাথরুম, এবং ঐ ফিল্টারের মধ্যে বাসা বাঁধা বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়া যারা ফিল্টারের মধ্যে জমা হওয়া মাছের বর্জ্য পদার্থ বিয়োজিত করে তারা সাফাইকর্মী। সাফাইকর্মীদের ছাড়া যেমন সমাজ চলে না, তেমনি বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়াদের ছাড়া অ্যাকোয়ারিয়াম চলে না।। এবার ধরুন শহরের জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের কথা। যদি শহরের জনসংখ্যার পরিমাণ কম থাকে, এবং শহরের আয়তন বেশি হয় এবং উপযুক্ত সংখ্যক সাফাইকর্মী থাকেন তবে সেই শহর আবর্জনা মুক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। কিন্তু যদি শহরের জনসংখ্যার তুলনায় শৌচাগার এবং সাফাইকর্মী দুইই কম থাকে সেক্ষেত্রে শহরের পরিবেশ দ্রুত নোংরা হতে থাকে। এবং নানান রোগের কবলে পড়ে শহরের মানুষের গড় আয়ু কমতে থাকে। এবার আপনার ট্যাঙ্কের কথাটা ভাবুন যদি আপনি আপনার ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কম মাছ রাখেন, ফিল্টারের সংখ্যা বেশি থাকে এবং সেখানে বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়াদের কলোনি উপযুক্ত মাত্রায় থাকে তবে সহজেই কিন্তু আপনার ট্যাঙ্ক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রোগহীন সুস্থ মাছের আবাসস্থল হয়ে উঠবে। এই পরিবেশটাই হচ্ছে এক কথায় ট্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

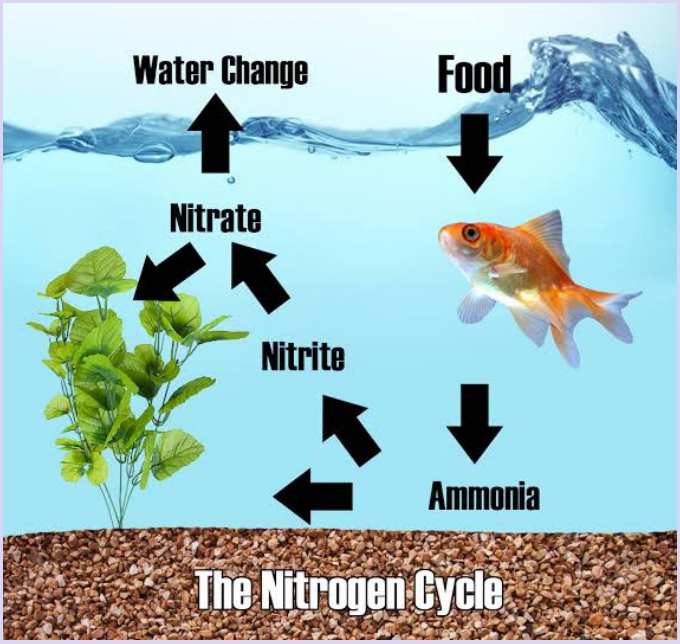

(১২) ট্যাঙ্ক সাইকেল কি?

ট্যাঙ্ক ব্যালেন্স একটি ভারসাম্য অবস্থা, সেই ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর রাস্তাটাই ট্যাঙ্ক সাইকেল। ধরুন আপনি একটি নতুন অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করে, নতুন জল ঢেলে নতুন ফিল্টার চালিয়ে সাথে সাথে মাছ রাখতে শুরু করলেন, মাছটি কি বাঁচবে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর হচ্ছে না। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া মাছটির সুস্থ সবলভাবে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ ঐ যে বাড়ি আছে, বাথরুম আছে সাফাইকর্মী নেই। অর্থাৎ ট্যাঙ্কে মাছ ছাড়ার আগে সাফাইকর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং তাঁদের সংখ্যা এতো বাড়াতে হবে যাতে মাছ ছাড়লে ওদের বর্জ্য পদার্থ সহজেই বিয়োজিত হয়ে যায়, এবং মাছের বর্জ্য পদার্থ থেকে তৈরি অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটের মতো ক্ষতিকারক পদার্থ বেশি মাত্রায় ট্যাঙ্কে না থাকতে পারে। এজন্য সবার আগে দরকার বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়াদের। যাদের আপনি পেয়ে যাবেন পুরোনো কোন অ্যাকোয়ারিয়ামের ফিল্টার প্যাডে। বন্ধু-বান্ধব যাদের অ্যাকোয়ারিয়াম আছে তাদের থেকে পুরোনো নোংরা ফিল্টার প্যাড যোগাড় করে চালিয়ে দিন আপনার নতুন ট্যাঙ্কে। ২৪x৭ ফিল্টার চালান, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার ট্যাঙ্কে ভর্তি হয়ে যাবে বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়া, তারপর ধীরেসুস্থে, খুব অল্প অল্প করে মাছ ছাড়ুন, যাতে দুম করে মাছের সংখ্যা (পড়ুন বায়োলোড) বেড়ে গিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যালেন্স নষ্ট না হয়। অল্প কিছু মাছ ছেড়ে তারা সুস্থ সবল থাকলে আবার দু একটা করে মাছ ছাড়তে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন সেই সংখ্যা যেন কখনোই অ্যাকোয়ারিয়ামের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি না হয়ে যায়। তবে যদি কোন কারণে পুরোনো ফিল্টার প্যাড যোগাড় করতে না পারেন তবেও চিন্তা নেই, বাজারে আজকাল বেনিফিসিয়াল ব্যাক্টেরিয়া বুস্টার পাওয়া যায়, সেগুলো কিনে এনে নির্দেশ মতো ব্যবহার করতে পারেন, সমমানের সুফলই পাবেন।

(১৩) মাছ ছাড়ার পর ট্যাঙ্ক মেইনটেন্যান্স কিভাবে করবো?

যে কোন প্রাণীর পোষার ক্ষেত্রে পরিচর্যা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই। সময় পাচ্ছি না বা ইচ্ছা করছে না-র অজুহাতে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অ্যাকোয়ারিয়ামের দেখভাল প্রক্রিয়াটি আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে করতে পারি, এতে যেমন সময় বাঁচে, তেমনি মাছেরাও সুস্থ থাকতে পারে।

* দৈনিক পরিচর্যা: ক) দিনে একবার বা দুইবার (সকাল এবং বিকাল, রাত্রি নয়) খেতে দেওয়া। খ) লাইট জ্বালানো এবং বন্ধ রাখা, অন্যান্য ইলেকট্রিক দ্রব্য যেমন পাম্প,ফিল্টার ইত্যাদি ঠিকঠাক চলছে কি না পর্যবেক্ষণ করা। গ) দিনের কিছুটা সময় মাছকে দেখা, যাতে কোন মাছের কোন সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে কি না বোঝা যায়।

** সাপ্তাহিক পরিচর্যা: ঘ) অ্যাকোয়ারিয়ামে সাইফন করে সাবস্ট্রেট থেকে অতিরিক্ত ময়লা আবর্জনা তুলে ফেলা, এবং সেভাবে ৩০-৪০% পর্যন্ত জল পরিবর্তন করে দেওয়া। ঙ) অ্যাকোয়ারিয়ামের কাঁচের গা থেকে সুতির কাপড় দিয়ে ঘষে অ্যালগি পরিস্কার করে দেওয়া।

* মাসিক পরিচর্যা: চ) একাধিক ফিল্টারের ক্ষেত্রে একটা একটা করে ফিল্টার প্রতি মাসে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিস্কার করা। তবে কখনোই সব ফিল্টার একসাথে পরিস্কার করবেন না, তাহলে বিপুল পরিমাণ বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়াদের কলোনি নষ্ট হয়ে ট্যাঙ্কের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে।

ছ) অ্যাকোয়ারিয়ামের সাজসজ্জার ছোটখাটো পরিবর্তন ইত্যাদি মাসে একবার করা যেতে পারে।

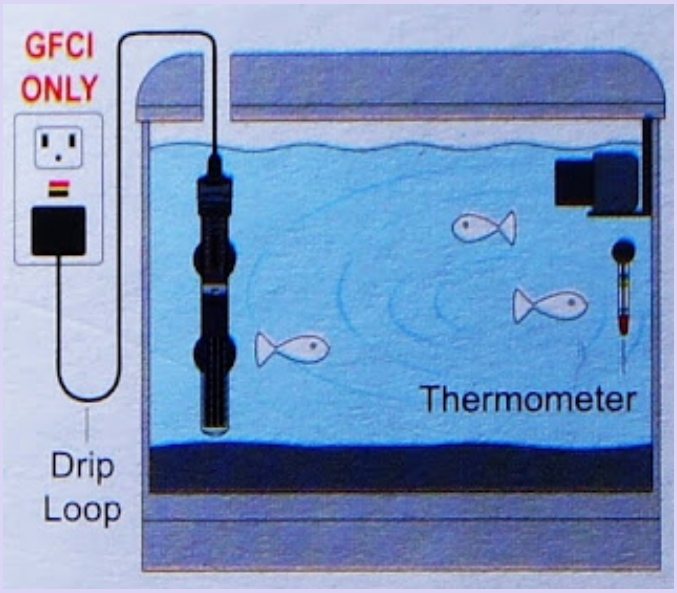

শীতে থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করতে হবে হিসেব করে

(১৪) শীতকালে মাছের পরিচর্যা কি হবে?

শীতকাল মানেই বেশিরভাগ ট্রপিক্যাল মাছের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচর্যা নেওয়ার মরশুম। এই মরশুম যেন অনেকটা প্রাকৃতিক এলিমিনেটর। প্রকৃতিতে দুর্বল মাছেরা শীতকালীন আবহাওয়া পরিবর্তন সহ্য না করতে পেরে মারা যায়, শক্তিশালী ও সবল মাছেরা শীত অতিক্রম করে আবার প্রজননের সুযোগ পায়।

অর্থাৎ অনেকটা যেন প্রকৃতিই পরীক্ষা নেয়। তবে পয়সা খরচ করে পোষা আদরের মাছ প্রকৃতির এই নির্মম পরীক্ষায় বসুক এটা যেহেতু আমাদের ভালো লাগবে না তাই আমাদের কতগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যেমন অ) শীতকালে মাছের জন্য হিটার বা থার্মোস্ট্যাটের ব্যবস্থা করে জল গরম রাখা। জলের তাপমাত্রা ২৬-২৮° সেন্টিগ্রেড থাকুক এটাই বেশিরভাগ ট্রপিক্যাল মাছের পছন্দ। সেই অনুযায়ী পুরো শীতের মরশুমে এই তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। আ) মাছেরা শীতল রক্তের প্রাণী, সেকারণেই শীতকালে তাপমাত্রা কমলে এদের চঞ্চলতা কিছুটা কমে যায়, কিছু কিছু মাছ শীতঘুমেও যেতে পারে। সেই কারণেই শীতকালে এদের খাওয়া দাওয়ার অনীহা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে মাছ খেতে না চাইলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াই উচিত। কতটা কমাবেন সেটা সেটা আপনাকেই আপনার মাছের আচরণ দেখে বুঝতে হবে। ই) শীতকালে ট্যাঙ্কের বেনিফিশিয়াল ব্যাক্টেরিয়াদের কার্যক্রম কমতে থাকে, ফলে এই সময় বিভিন্ন রোগের সম্ভবনা তৈরি হয়। যদি আপনার ট্যাঙ্ক সাইকেল থাকে, ট্যাঙ্ক ব্যালেন্স যথাযথ হয়, মাছের সংখ্যা কম থাকে তবে আপনি আপনার অ্যাকোয়ারিয়াম নিয়ে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারেন। নচেৎ মাছের রোগভোগ হলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৫) মাছ যদি মরে যায় ?

শরীর থাকলে রোগ হবেই এবং নশ্বর শরীরের শেষ পরিণতিও মৃত্যু। ঠেকানোর উপায় নেই। সেক্ষেত্রে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ মরবেই, তবুও আমি মাছ করবো এই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামা ভালো। তবে বার্ধক্যজনিত মৃত্যু আটকানো না গেলেও মাছের অকালমৃত্যু আটকানো যায়। এবং সেটির সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে Precautions are better than cure, এই পনেরো নম্বর পয়েন্টটি লেখার আগে যে ১৪ টা পয়েন্ট লিখেছি, কমবেশি সেটাই precaution, রোগ এড়াতে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন, মাছের অপমৃত্যু আক্ষরিকভাবেই অনেক অনেক কমবে। তবুও যদি রোগ হয় কি করবেন ক) মাছকে খেয়াল করুন, দেখুন সাঁতার কাটতে অসুবিধা, পেট চুপসে যাওয়া, খাবার অনিহা, পাখনা বা লেজ চুপসে যাওয়া, শরীরে কোন ক্ষত, চুপচাপ বসে থাকা ইত্যাদির মতো এক বা একাধিক উপসর্গ দেখা যাচ্ছে কি না। যদি দেখা যায় তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত মাছকে আলাদা করুন। আলাদা করে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করুন। খ) যদি রোগ নির্ণয় নিজে না করতে পারেন তবে অভিজ্ঞ কারোর সহায়তা নিন। সঠিক রোগ নির্ণয় না হলে কখনোই চিকিৎসা শুরু করবেন না। মনে রাখবেন মাছের অসুখ মানেই সৈন্ধব লবণ আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ঠিক করা যায় না। আর পাঁচটা জীবের মতো বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসা লাগে। সেটা মেনে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। গ) লাল ওষুধ, নীল ওষুধ জাতীয় ওষুধের কার্যকারিতা না জেনে দুমদাম অ্যাকোয়ারিয়ামে ফোঁটা ফোঁটা ফেলা থেকে বিরত থাকা, এতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়। আজকাল মাছের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করলেই অনলাইনে বিস্তর পড়াশোনার সুযোগ আছে। সেগুলো পড়ন, জানুন এবং তারপর চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করুন। সামাজিক মাধ্যমে সবাই এক্সপার্ট, মাছের রোগ নিয়ে সমস্যায় পড়লে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হেল্প পোস্ট দিয়ে আপনি যে উপদেশগুলি পাবেন সেগুলোর শতকরা আশি ভাগ ভুলেভরা থাকার সম্ভাবনা, তাই সে পথ পরিত্যাগ করে নিজে পড়াশোনা বা জানার উপর বেশি গুরুত্ব দিন। একান্ত যদি রোগকে কাবু করতে না পারেন তবে অবশ্যই বিষেশজ্ঞের পরামর্শ নিন।

(১৬) মাছ কেনার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ?

রঙিন মাছের দোকানে গেলে মনে হয় পুরো দোকানের সব মাছগুলোই কিনে নিই, মনে হয় বাড়িতে একটা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম থাকলেই সব মাছ পোষা যাবে, কিন্তু বাস্তবে সেটা তো সম্ভব নয়, তাই অফুরন্ত মাছের ভান্ডার থেকে কয়েকটি মাছকেই আমাদের বেছে নিতে হয়। তবে কোন মাছ কিনবো ? কটা কিনবো, এসব সম্পর্কে আমাদের মাছ পোষার শুরুতেই ধারণা তৈরি হয় না, সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দোকানদারের উপর নির্ভর করি। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষে ভুল বোঝাবুঝি অনেক সময় বিপদ ডেকে আনতেই পারে। কোন মাছ কেনার আগে জানা দরকার অ) সেই মাছ কোন কোন মাছের সাথে থাকতে পারে, আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামে আগে থেকেই যেসব মাছেরা আছে, তাদের সাথে আদৌ থাকবে কি না, যদি উভয় মাছ একসাথে থাকে তবে নির্দ্বিধায় কিনতে পারেন। আ) কোন মাছ কি অনুপাতে রাখতে হয়, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী অনুপাত কি ? সেটা না জেনে একাধিক পুরুষ বা স্ত্রী মাছ কিনলেই মুশকিল, মারামারি আর চুলোচুলি তো লেগে থাকবেই, অকাল পঞ্চত্ব প্রাপ্তিও খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তবে হ্যাঁ সব মাছেরা কিন্তু made for each other ও হয় না, একটা পুরুষ এবং একটা স্ত্রী মাছ কিনে আনলেন আর জোড়া বেঁধে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করলো এতটাই দুয়ে দুয়ে চার হয় না। ই) এরপর মাছ কেনার সময় খেয়াল করুন যে মাছটি আপনি কিনতে চান সে অসুস্থ, দূর্বল বা কোন অস্বাভাবিকতা আছে কি না বা অসুস্থ মাছেদের সাথে আছে কি না। যদি না থাকে তবেই কিনুন। সুস্থ সবল মাছ বুঝে কেনা আপনার নিজের দায়িত্ব।

ঈ) মাছটি যে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা সেই অ্যাকোয়ারিয়ামের জলই প্লাস্টিকে ভরে মাছনিন। এতে মাছের স্ট্রেস তুলনামূলক ভাবে কম হয়। মাছটি পরিবহনের সময় অত্যাধিক ঝাঁকুনি না খায়, সেদিকেও নজর রাখুন।

(১৭) অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ কিভাবে ছাড়বো ?

আমরা যখন দোকান থেকে মাছ কিনি তখন সাধারণত পলিথিনের প্যাকেটে মাছ ভরে আমাদের দেওয়া হয়। এই সময় মাছটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বলাই বাহুল্য। বাড়িতে এনে তাকে ধীরে ধীরে আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হয়। সেই সুযোগ করে দেওয়ার প্রথম পর্যায় মাছ 'সিজন' করা এবং তারপর নতুন অ্যাকোয়ারিয়ামে ছাড়া।

মনে রাখতে হবে যে অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে মাছটি এসেছে সেই অ্যাকোয়ারিয়াম এবং আপনার নিজস্ব অ্যাকোয়ারিয়ামের জলের পরিবেশের

মধ্যে কিছুটা ফারাক থাকাই স্বাভাবিক। সেটুকু ফারাক দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো মেনে চলা উচিৎ। ক) মাছটি আনার পর মাছের প্যাকেট খুলে মাছটি মাছটিকে জল সহ অন্য একটি পাত্রে রাখুন। খ) যে অ্যাকোয়ারিয়ামে আপনি মাছটি ছাড়তে চান সেখান থেকে একটি সরু এয়ারলাইন পাইপের মাধ্যমে অ্যাকোয়ারিয়ামের জল সাইফন করে ফোঁটা ফোঁটা করে নতুন আনা মাছের পাত্রে ফেলুন। গ) মাছের পাত্রে যতটুকু প্যাকেটের জল ছিল, ফোঁটা ফোঁটা করে তার দ্বিগুণ পরিমাণ নতুন জল ঐ মাছের পাত্রে ঢালুন। এরপর আধ ঘন্টা অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনে মাছের পাত্রে অক্সিজেন পাম্প চালিয়ে একটু এয়ারেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এভাবে মাছটি ধাতস্থ হয়ে গেলে তবেই মূল অ্যাকোয়ারিয়ামের ছাড়তে পারেন। তবে এটা গেল নতুন অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রথম মাছ ছাড়ার পদ্ধতি। তবে প্রতিষ্ঠিত ট্যাঙ্কে পুরোনো মাছের সাথে নতুন মাছ ছাড়তে হলে অথবা কোন মাছের কোন অসুখ-বিসুখের সন্দেহ হলে নতুন কিনে আনা মাছকে প্রথমেই অ্যাকোয়ারিয়ামে পুরোনো মাছের সাথে না ছেড়ে দিন পনেরো কোরান্টাইন ট্যাঙ্কে আইসোলেশনে রাখুন। সেখানে নতুন আনা মাছটিকে ধাতস্থ হতে দিন। দরকার হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, তারপর মাছ একেবারে সুস্থ বুঝলে তবেই মূল ট্যাঙ্কেই ছাড়ুন। তবে ট্যাঙ্ক থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু সেই ড্রিপিং পদ্ধতি (ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলে সিজন করা) অবলম্বন করা উচিত। এতে যেমন টেম্পারেচার, পিএইচ এবং টিডিএস শক এড়ানো যায় তেমনি মাছের অপমৃত্যু অনেক বেশি পরিমাণে আটকানো যায়।

(১৮) একজন অ্যাকুয়ারিস্টের কি কি সরঞ্জাম দরকার ?

অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষতে হলে, অ্যাকোয়ারিয়াম, ফিল্টার, ঢাকনা, পাম্প, হিটার আলো ইত্যাদি বেসিক সরঞ্জাম ছাড়াও কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হাতের কাছে রাখা দরকার। যেমন২টি মাছ ধরার জাল (একটি ছোট একটি বড়), পিএইচ মিটার, টিডিএস মিটার, কাঁচি, চিমটা, টেস্টার (যেহেতু অ্যাকোয়ারিয়ামে জলের কাছেই বিদ্যুৎ থাকে, তাই এটি আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে), ওয়াটার টেস্টিং কিট (রাখলে অবশ্যই ভালো) মাছের কিছু সাধারণ ওষুধপত্র, স্ক্রাবার স্পঞ্জ/সুতির কাপড়, বালতি, গামলা, মগ, অতিরিক্ত একটি পাম্প, এয়ারলাইন পাইপ, রেগুলেটর, ডিভাইডার, থার্মোমিটার, এয়ার স্টোন ইত্যাদি।

এই পর্যন্ত পড়ে ফেললেই মাছ পোষার সাধারণ গাইড লাইন মোটামুটি শেষ। এরপর আপনার নিজস্ব কেরামতির পালা। মাছ পুষতে হলে যেমন কিছুটা সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণ করা দরকার, তেমনি অনেক কিছুই আপনাকে নিজেকেই করে করে শিখতে হবে। ভুল ভ্রান্তি হবে, মাছ মরবে, অ্যাকোয়ারিয়াম করার প্রতি হয়তো কখনো কখনো বিতৃষ্ণাও চলে আসবে তবে শেষ পর্যন্ত মাছ আমি করবোই, এই ইচ্ছাশক্তিটাও বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে, অভিজ্ঞতা তৈরি হবে। এবং অভিজ্ঞতাই হবে আপনার আসল গাইডলাইন। ততদিন পর্যন্ত এই লেখালিখিটা নতুনদের জন্য একটা দিক নির্দেশক হয়ে থাক। মাছ ভালোবেসে এতোটা সময় খরচ করে লেখাটা পুরোটা পড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

।। উপমহাদেশীয় জলজ গাছ।।

অভীক ঘোষ

‘মেছোবই’ দ্বিতীয় তথা পুজো সংখ্যায় প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়ামের বিভিন্ন শৈলী সম্মন্ধে আমাদের আলোচনা নিশ্চয়ই আপনাদের সবার খেয়াল আছে। আর যদি কোনোভাবে মনে নাও পড়ে, তাহলে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের শৈলী সম্পর্কিত আলোচনাটায় এখন চোখ বোলাতে গিয়ে আপনার নিশ্চয়ই একটা জিনিস চোখে পড়বে- সেটা হলো প্রায় সবরকম শৈলীতেই, সেটা কম-বেশী যাই হোক না কেন, কোনো না কোনো জলজ উদ্ভিদের উপস্থিতি। তাই যে কোনো শৈলী অনুসরণ করতে গেলে আপনাকে সেই শৈলীর ব্যবহৃত গাছ সম্পর্কে তো একটু খোঁজ খবর নিতেই হবে, তাইনা! সেই কথা মাথায় রেখে এইবারের আলোচনায় তাই নজর দেওয়া হয়েছে আমাদের উপমহাদেশের কিছু জলজ গাছপালার ওপর যাদের আপনি একাধিক শৈলীতে ব্যবহার করে আপনার অ্যাকুয়ারিয়ামকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে পারবেন।

কোনও অ্যাকুয়ারিয়ামে জলজ উদ্ভিদ বসিয়ে তাকে প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়ামের রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ঠিকঠাকভাবে উদ্ভিদ চয়ন করা। কারন একটা প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়ামের প্রাণ হল উদ্ভিদ। এবার প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়ামে শুধু উদ্ভিদ বসিয়ে দিলাম, কাজ শেষ, ব্যাপারটা ঠিক ততোটাও সোজা না। প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়াম এর মুল উদ্দেশ্য উদ্ভিদের সঠিক প্রতিপালন, তাদের শৈলী অনুসারে আকার দেওয়া, এবং উদ্ভিদদের সুস্থ রাখা। তাই গাছ বাছাই করার আগে সেই গাছ সম্মন্ধে ভাল করে জানা দরকার কারণ বিভিন্ন উদ্ভিদের চাহিদা বিভিন্ন রকম। যেমন কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের আলো বেশী লাগে, কিছু গাছে আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশী পরিমাণ দিতে হয়, কিছু উদ্ভিদ আবার তুলনায় ঠান্ডা জল পছন্দ করে। আবার কোনো উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি বাড়ে, কোনো উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয়। আবার উদ্ভিদের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে কোনো উদ্ভিদকে পিছনে, কোনো উদ্ভিদকে মাঝে, কিছু উদ্ভিদকে সামনে বসাতে হয়। আবার কিছু উদ্ভিদের জন্য ভাল সার যুক্ত মাটি লাগে। আবার কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ পাথর বা কাঠের উপর হয়ে থাকে। তবে প্লান্টেড ট্যাঙ্ক করার সময় মাটির ব্যবহার করাই ভাল। এবার প্ল্যান্টেড অ্যাকুয়ারিয়ামের গাছ তো আর এক বা দুই রকমের হয় না, প্রাপ্তিস্থান অনুসারে এর বহু রকম প্রকারভেদ আছে। কিছু উদ্ভিদ এর উৎস সুদূর আমাজন তো কোন উদ্ভিদ আফ্রিকাতে হয়। তেমনই অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের উৎস আমাদের উপমহাদেশ। আমাদের এই প্রতিবেদন সেই সব উপমহাদেশীয় গাছপালা নিয়ে। কিছু উদ্ভিদের উৎস হয়তো উপমহাদেশ না, কিন্তু সেই সব উদ্ভিদ আমাদের ধান জমি বা জলা জমিতে দেখতে পেয়ে থাকি। আমরা এখানে কিছু সহজ উদ্ভিদ, কিছু অপেক্ষাকৃত কঠিন উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করব। সহজ উদ্ভিদ বলতে যে সমস্ত উদ্ভিদ অল্প আলো, সার এর ব্যবহারে করা যেতে পারে। মানে তথাকথিত লো-টেক ট্যাঙ্কে এই সব উদ্ভিদের ব্যাবহার করে সহজেই প্লান্টেড ট্যাঙ্কে হাতেখড়ি দেওয়া যায়। তবে এটাও সত্যি যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিলে সেই গাছগুলোরই চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়।

১) অ্যাপোনোজিটন (*Aponogeton* sp.) - কিছু দিন আগে আমি এক গ্রামে গেছিলাম ঘুরতে, ইট-সিমেন্ট এর কৃত্রিম জগৎ ছেড়ে প্রকৃতির কোলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে। সেখানেই একদিন সকালে ধান জমিতে গিয়ে জলের তলা তে একরকম জলজ উদ্ভিদ দেখতে পাই। কিছু তুলে দেখি কন্দমুল যুক্ত উদ্ভিদ। বাড়িতে এসে পড়াশোনা করে তার আসল নাম জানতে

অ্যাপোনোজিটন

পারি *Aponogeton* বা অ্যাপোনোজিটন। এদের কিছু প্রজাতির উৎস আফ্রিকা, মাদাগাস্কার হলেও আমাদের স্থানীয় জলাশয়, ধান জমিতে এদের বেশ কয়েকটি প্রজাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা খুব সহজেই ট্যাঙ্ক এ টিকে যায়। অল্প কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মাঝারি উজ্জ্বলতার আলো, এবং অল্প পরিমাণ সারে এই গাছ খুব ভাল বৃদ্ধি পায়। একটা কন্দ থেকে ২০-৩০ খানা পাতা বেরতে পারে। এই উদ্ভিদ সাধারণত ট্যাঙ্ক এর মধ্য ও পিছনের দিকে ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। ২০-২৫ সেমি পর্যন্ত উচ্চতা হতে পারে এই উদ্ভিদের। এটা একটা লো-টেক এর জন্য আদর্শ গাছ।

২) হাইগ্রোফিলা ডিফর্মিস (*Hygrophila difformis*) - ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসা হাইগ্রোফিলা ডিফর্মিস একটি সুন্দর ও একটি সহজ স্টেম উদ্ভিদ।

প্রকৃতিতে হাইগ্রোফিলা ডিফর্মিস

ডালপালা ২০-২৫ সেমি লম্বা এবং ৫-১০ সেমি চওড়া হয়। যারা নতুন প্লান্টেড ট্যাঙ্ক করছে তাদের জন্য হাইগ্রোফিলা ডিফর্মিস একটি আদর্শ উদ্ভিদ,যা শুরু থেকে অ্যাকোয়ারিয়ামে ভারসাম্য তৈরি করতে সহায়তা করবে। এর দ্রুত বৃদ্ধি শ্যাওলা প্রতিরোধে সাহায্য করে কারণ এরা জল থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি শোষণ করে। এই গাছ করা অতি সহজ। এদের চাহিদাও খুবই কম। অল্প

সার,মাঝারি আলো, অল্প পরিমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিলে কিছু দিনেই ট্যাঙ্ক ভরে যাবে। কিন্তু। যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি এরা ছড়িয়ে যায় তাই ছোট ট্যাঙ্কে এই গাছ করা একটু ঝক্কির তো বটেই। এই গাছ সাধারণত ট্যাঙ্ক এর পিছনের সারি তে বসানো হয়। এরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে তাই কিছু দিন অন্তর কাটিং করতে হয়। এই কাটা অংশকে মাটিতে বসিয়ে দিলে পুনরায় নতুন গাছ পাওয়া যায়। এটি একটি লো-টেক এর জন্য আদর্শ উদ্ভিদ।

৩) হাইগ্রোফিলা কোরিম্বোসা (*Hygrophila corymbosa*) - হাইগ্রোফিলা কোরিম্বোসা একটি খুব সহজ স্টার্টার উদ্ভিদ যা এশিয়া থেকে উদ্ভূত। এটিও একটি সহজ স্টেমযুক্ত উদ্ভিদ। এর মুল আকর্ষণ উজ্জ্বল সবুজ, লম্বা এবং চওড়া পাতা। খুবই সহজে এই গাছ অ্যাকুয়ারিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে, চাহিদাও খুবই কম। অল্প আলো , কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সারের প্রয়োগে এই গাছ খুব সুন্দর একটা ঝোপ তৈরি করে। এই গাছও খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, ফলে কাটিং করে গাছের আকার সঠিক রাখতে হয়, ও সেই কাটা গাছ থেকে নতুন গাছ তৈরি করা যাই অতি সহজে। এই উদ্ভিদ ট্যাঙ্ক এর মাঝামাঝি বা পিছনের সারিতে বসানো হয়ে থাকে।

হাইগ্রোফিলা কোরিম্বোসা

৪) হাইগ্রোফিলা পলিস্পার্মা (*Hygrophilo polysperma*) - এটি আর একটি জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ যা লো-টেক ট্যাঙ্কের জন্য বেশ আদর্শ। হাইগ্রোফিলা পলিস্পার্মা একটি সহজ স্টেমযুক্ত উদ্ভিদ ও নতুন প্লান্টেড ট্যাঙ্ক যারা করছে তাদের জন্য খুব সুবিধার। এই উদ্ভিদ অতি সহজে যেকোনো পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে। এরা অল্প সার,কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর অল্প থেকে মাঝারি উজ্জ্বলতার আলোতে খুব ভাল বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এত তাড়াতাড়ি এদের বৃদ্ধি হয়ে থাকে যে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কাটিং করে এদের বৃদ্ধি কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ডালপালা নিয়ে এদের উচ্চতা মোটামুটি ২৫-৪০ সেমি হয় এবং এরা ৪-৮ সেমি মতো চওড়া হয়, তাই এই উদ্ভিদ সাধারণত পিছনের সারিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

হাইগ্রোফিলা পলিস্পার্মা

৫) হাইগ্রোফিলা পিনাটিফিডা (*Hygrophila pinnatifida*) - হাইগ্রোফিলা পিনাটিফিডা এমন একটি উদ্ভিদ যেটাকে নিয়ে না বললে এই উপমহাদেশের জলজ গাছ সম্পর্কে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বর্তমানে এই উদ্ভিদের চাহিদা প্রচণ্ড বেশী। এটিও একটি সহজ স্টেমযুক্ত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এর পাতার গঠন।।

এই গাছ আনুবিয়াস, ফার্ন এর মত পাথরে বা কাঠে বেঁধে বসাতে হয়। তীব্র আলো পেলে এই উদ্ভিদের পাতার রঙ লালচে হয়ে যায়। এই উদ্ভিদের জন্য একটু বেশী পরিমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সারের প্রয়োজন। মাঝারি আকারের এই গাছ ট্যাঙ্কের মধ্য ভাগে বা পিছনে শৈলী অনুসারে ব্যবহার করা যায়। এই গাছের বৃদ্ধি বেশ তাড়াতাড়ি হয় ও অনেক সময় ট্যাঙ্কের জলের উপরে উঠে আসে এবং সেই অংশে বেগুনী রঙের সুন্দর ফুল হয়। উত্তর কানাডাতে প্রাপ্ত এই উদ্ভিদের প্রজাতির পাতায় লাল ভাব অনেক বেশী হয়।

হাইগ্রোফিলা পিনাটিফিডা

৬) লগেনেন্দ্রা (*Lagenandra* sp.) - এই উদ্ভিদটি মূলত ভারত থেকে এসেছে এবং এটি একটি মাঝারি আকারের, চওড়া-পাতার ক্রিপ্টোকোরিনের মতো একটি গাছ। এটি ক্রিপ্টোকোরিনের মতোই অ্যাকোয়ারিয়ামে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এদের রঙের ঠিকঠাক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত আলোর প্রয়োজন। এদের পাতা ৪-৮ সেমি চওড়া এবং ৬-১২ সেমি লম্বা হওয়ার দরুণ এই গাছ দেখতে বেশ চওড়া লাগে। এদের রঙ একই পাতায় প্রায়শই উজ্জ্বল বেগুনি ও অনুজ্জ্বল সবুজ থেকে লাল-বেগুনি পর্যন্ত হয়। নতুন পাতাগুলো ফ্যাকাশে গোলাপী হয়ে থাকে। এতি একটি লো-টেক এর জন্য আদর্শ গাছ,তবে এই গাছের অল্প কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন হয়। এই গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে। সময়ের সাথে সাথে এই গাছ একটা পুরু লতানো রাইজোম গঠন করে এবং সেখান থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।

লগেনেন্দ্রা

৭) লিমনোফিলা সেসিলিফ্লোরা (*Limnophila sessiliflora*) - লিমনোফিলা গোত্রের অনেক প্রজাতির উৎস এই উপমহাদেশ, তার মধ্যে লিমনোফিলা সেসিলিফ্লোরা অন্যতম। এটিও একটি সহজ স্টেমযুক্ত উদ্ভিদ। খুব সহজে অল্প আলো, সারের ব্যবহারে এই গাছসুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠে। তবে অন্য গাছেদের মতোই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ব্যবহারে এদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এই গাছ একসাথে অনেকগুলো বসালে দেখতে বেশ ভাল লাগে। এদের অনেক সময় কাবম্বা-র বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্ভিদ কে পিছনের সারি তে ব্যবহার করা হয়। এতক্ষণ আমি যে উদ্ভিদগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো মুলত লো-টেক ট্যাঙ্কের জন্য বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে। এর পরে আমি যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই উপমহাদেশীয় জলজ উদ্ভিদদের চাহিদা একটু বেশী। এদের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড, উচ্চ তীব্রতার আলো, সার প্রয়োজন হয়।

৮) লিমনোফিলা আরোমাটিকা (*Limnophila aromatica*) - এটা একটা সহজ স্টেম উদ্ভিদ যা এশিয়াতে পাওয়া যায়। এটি প্রায়শই এশিয়ার ধানের জমিতে আগাছা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদের পাতা সরু সবুজ এবং পিছনে বেগুনি হয়। অন্যান্য লাল উদ্ভিদের মতো এর রঙও উচ্চ আলোর সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলে দিলে এই গাছ তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে। এই উদ্ভিদ উচ্চ TDS এর জলেও ভাল ভাবেই হয়। এদের প্রধানতঃ পিছনের সারিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই উদ্ভিদ ডাচ শৈলী তে বহুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

লিমনোফিলা আরোমাটিকা

৯) এরিওকুলন রত্নাগিরিকাম (*Eriocculon ratnagiricum*) - এই উদ্ভিদ এক বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ যা ভারত থেকে উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভিদ শুধুমাত্র ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের রত্নগিরির কাছে পাওয়া যায়। এই গাছ এর উচ্চতা কম হয় তাই এই উদ্ভিদ কে সামনের সারি তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই উদ্ভিদ দেখতে অনেকটা সজারুর মত, তবে এই উদ্ভিদের চাহিদা খুব বেশী ফলে এই গাছ করতে অভিজ্ঞতার দরকার। তাছাড়া এই গাছ বর্তমানে বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাই এই গাছ এর ব্যবহার না করাই উচিত।

এরিওকুলন রত্নাগিরিকাম

১০) স্যালভিনিয়া (*Salvinia* sp.) - উপরে যে উদ্ভিদগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল, সেগুলো সবই জলের নিচে হয়। কিন্তু এই স্যালভিনিয়া ভাসমান উদ্ভিদ। এদের মূল উৎস আফ্রিকা হলেও বর্তমানে আমাদের স্থানীয় জলাশয়ে এদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুন্দর সবুজ রঙ এর পাতা পরপর সাজানো, আর পাতার ওপরে "স্পাইক" এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলায় এদের "ইঁদুর কানি" বলেও ডাকা হয়।

স্যালভিনিয়া

এই উদ্ভিদ কে ট্যাঙ্কে ব্যবহার করে ট্যাঙ্কের জলে মিশে থাকা নিউট্রিয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাতে শ্যাওলার পরিমাণ কিছুটা কমে। তবে এদের উজ্জ্বল আলোর নিচে রাখলে এরা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় ও ট্যাঙ্কের উপরে ছড়িয়ে যায়। তাহলে আর একদম দেরী না করে বেছে ফেলুন কোন ধরণের উপমহাদেশীয় জলজ উদ্ভিদ আপনার ট্যাঙ্কের সাথে মানানসই হবে আর ঠিক করে ফেলুন তাকে যত্নই বা করবেন কিভাবে। তারপর অপেক্ষা করুন কিভাবে আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামের ঘর হয়ে যায় আপনার বাড়ির অন্যতম দর্শনীয় জায়গা।

চিত্র সূত্র - ইন্টারনেট।

।। মাছের আঁকা, আঁকার মাছ।।

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

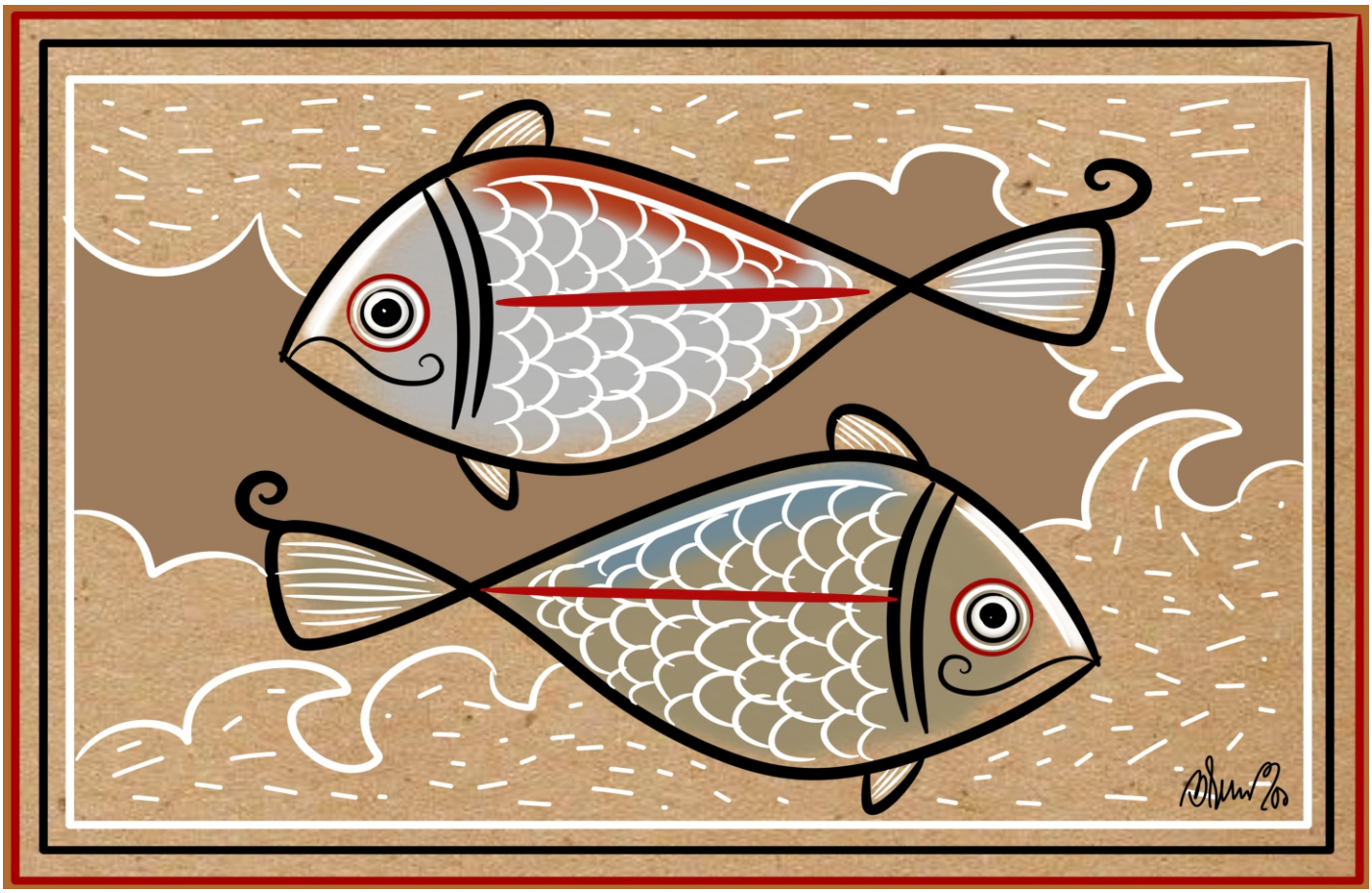

শিল্পী- তৌসিফ হক

Art washes away from the soul the dust of everyday life...

পাবলো পিকাসোর এই উক্তিটা আমার খুব পছন্দের। সত্যিই তো আর্ট আমাদের মনের প্রতিদিনের ধুলোকে ধুইয়ে দেয়। মনে পড়ছে কিছু? হ্যাঁ,কবিগুরুও একই কথা প্রায় বলে গেছেন, 'মনের কোণের সব দীনতা, মলিনতা ধুইয়ে দাও' এবার প্রশ্নটা হলো আমি একটা আদ্যোপান্ত মাছের ম্যাগাজিনে এইসব আর্ট, পিকাসো, রবি ঠাকুরকে নিয়ে খামোখা কেনো টানাহ্যাঁচড়া করছি? ! আচ্ছা, এক মিনিট একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো ! এই যে আপনি সকালে উঠেই নরম রোদ পড়া ট্যাঙ্কের সামনে আপনার প্রিয় মাছের রূপ দেখে মুগ্ধ হন, এটা আর্ট নয়? বাজারে পটল কিনতে কিনতে ভাবতে থাকেন যে স্কেপটা কিভাবে সাজাবো, সেটা আর্ট নয়? রাস্তায় যেতে যেতে একটা ভাঙা গাছের ডাল বা গুঁড়ি দেখে দাঁড়িয়ে ভাবেন যে কোনখানটা কেটে নিয়ে গেলে আপনার ট্যাঙ্কে মানাবে, এটা আর্ট নয়? নতুন ট্যাঙ্ক তৈরী করার আগে একটা সাদা পাতায় ট্যাঙ্কের সম্ভাব্য স্কেপের ছবি আঁকেন, সেটা আর্ট নয়? সবই আর্ট দাদা দিদিরা, কেবল আমরা ধরতে পারি না! এই মাছের প্রতি ভালোবাসা আমাদের অজান্তেই আমাদের মধ্যে আর্টিস্ট স্বত্তাকে জাগিয়ে তোলে। এবার দেখুন, আর্টের তো অনেক রকমফের হয় এবং প্রত্যেক রকমই নিজ গৌরবে গৌরবান্বিত। তাই আমি তার মধ্যে থেকে মাত্র একটি আর্ট ফর্মকে বেছে নিয়েছি যা হয়তো পৃথিবীর প্রাচীনতম ফর্ম ছবি আঁকা ! এই ছবি বা পেন্টিঙের সামান্য কিছু উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখবো যে কিভাবে এই আর্ট ফর্মের মধ্যে বহুদিন ধরে মাছের উপস্থিতি রয়েছে।

যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসী এসথেটিকসদের মধ্যে art for arts sake এই মতামত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তবুও ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে প্রাচীন কাল থেকেই আর্ট বা ছবি আঁকার সাথে তৎকালীন সমাজ ও সময়ের সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়, সেটা গুহাচিত্রের শিকারের দৃশ্যই হোক বা চার্চের মধ্যে আঁকা ধর্মীয় চিত্রই হোক। তাই আমরা যদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে কালানুক্রমিক ভাবে এগোই তাহলে দেখবো প্রাচীন ভারতীয়, সুমেরীয়, ঈজিপ্সীয়ান সভ্যতায় মাছকে জীবন ও উর্বরতার ধর্মীয় রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো তার অন্যতম কারণ ছিল প্রাণের প্রথম উৎসস্থলকে অজান্তেই সম্মান জানানো। ভারতীয় পুরাণে যেমন বিষ্ণু দেবতার মৎস্য অবতারের ছবি পাই যিনি প্রলয়ের সময় মনু সহ আরো সাত মহাত্মাদের রক্ষা করেছিলেন তেমনি খ্রীষ্ট ধর্মের বাইবেলেও আমরা পাই জোনাহ ও তিমি-র (যদিও তিমি মাছ নয়, স্তন্যপায়ী) ছবি। তবে এদের মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় বোধহয় ঈজিপ্সীয়ান সভ্যতার গল্প যার চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফে (যেহেতু অক্ষর গুলো ছবি এঁকে বোঝানো হতো এক্ষেত্রে তাই হায়রোগ্লিফকে আমি ছবির মধ্যেই ধরেছি) মোট ৬ রকমের মাছের ছবি পাওয়া যায় যার মধ্যে আছে *Barbus bynni– Tilapia nilotica– Mugil cephalus– Mormyrus kannume– Petrocephalus bane– Tertrodon fahaka* এর মধ্যে তিলাপিয়া মাছকে ধরা হতো

পুনর্জন্মের প্রতীক। কিছু কিছু জায়গায় তার জন্য মাছ খাওয়াও বারণ ছিল। তবে কিছু অন্য প্রমাণের সাথে বিভিন্ন প্রাচীন চিত্রে পাওয়া মাছ ধরার ছবি প্রমাণ করে যে মাছ মিশরীয়দের খাদ্যতালিকায় বেশ ওপরের দিকেই ছিল। এবার এই মাছকে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে দেখাটা কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মে বেশ প্রচলিত ধারণা কারণ সেই তিমি মাছ জোনাহ কে গিলে নেওয়ার তিন দিন পর তিনি আবার প্রার্থনা করে বেরিয়ে আসেন বা তাঁর পুনরায় জন্ম হয়। খ্রীষ্টানদের ব্যাপ্টিজমের জায়গায় থাকতো মাছের ছবি কারণ তাঁরা মনে করতেন যে মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না তেমনি একজন প্রকৃত খ্রীস্টানও ব্যাপ্টিজমের জল ছাড়া মুক্তি পেতে পারে না। তৎকালীন অনেক চার্চের গায়ে দেখা যেত এক মাথা কিন্তু তিন শরীরওয়ালা এক মাছের ছবি যাকে বলা হতো Divine Trinity এবং যার প্রকৃত অর্থ নাকি যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তির কাছেই পরিস্ফুট হবে। এর সাথে উল্লেখ করতেই হয় Ring of the fisherman এর কথা যা ১৮৪২ সাল অবধি পোপের কাছে শোভা পেত সীলমোহর হিসাবে। পোপ চতুর্থ ক্লিমেন্টের সময়, ১২৬৫ সালে, ওনার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এই সীলমোহরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পোপ হলেন ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর সেই হিসাবে সেন্ট পিটারের উত্তরসূরী। আর সেন্ট পিটার যেহেতু ধীবর ছিলেন তাই তাঁর সম্মানার্থে পোপের ওই অফিসিয়াল পিতলের সীলমোহরে মাছ ধরা অবস্থায় সেন্ট পিটারের ছবি শোভা পেত। এভাবেই প্রাচীন কালে আমরা যতো মাছের ছবি পাই তা প্রায় সবই ধর্মীয় চিন্তাভাবনার ফসল। কারণ তখন আর্টিস্টদের নিজস্ব স্বাধীন ধারণা ও শিল্পকর্মের সুযোগ বিশেষ ছিল না।

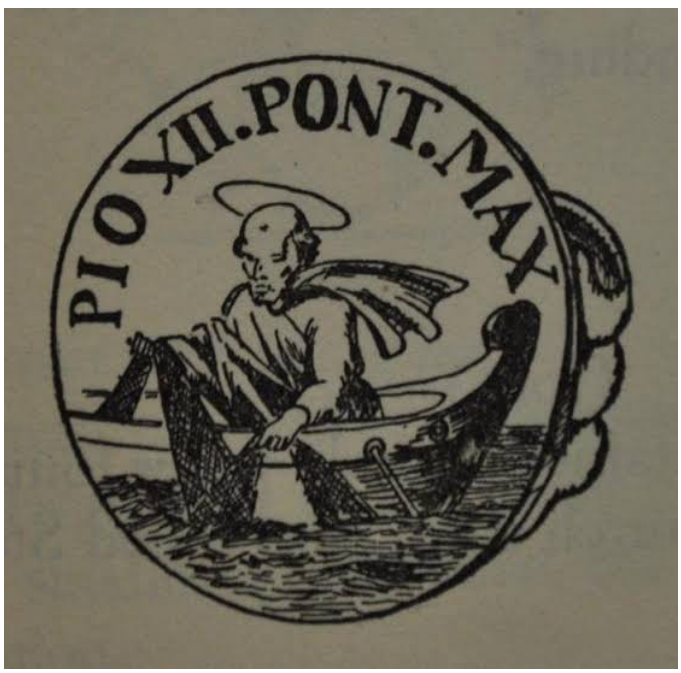

রিং অফ দি ফিশারম্যান

আস্তে আস্তে নবজাগরণের সময় থেকে এই ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করে। নবজাগরণের ফলে ইউরোপীয় আর্টিস্ট দের কাছে আস্তে আস্তে খুলে যেতে থাকলো পৃথিবীর দরজা, আর সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগলো নতুন ধরণের আঁকার ধারণা! পুরোনো ধর্মীয় রূপকের পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে আঁকার মধ্যে স্থান পেতে থাকলো আর্টিস্টের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, রূপক। আর এইক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন একাধিক ডাচ আঁকিয়েরা যার মধ্যে অন্যতম হলেন পিটার ব্রুগেল দ্যা এল্ডার। ১৫৫৯ সালে তিনি আঁকেন Netherlandish Proverbs যেখানে বিভিন্ন খন্ডচিত্রের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন প্রবাদকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই খন্ডচিত্রের মধ্যে দুটি ছিল মাছ সংক্রান্ত। একটিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন হেরিং মাছ ভাজছে। এটি হয়তো ছিল To fry the whole herring for the sake of the roe বা অল্প কিছু পাওয়ার জন্য

Netherlandish Proverbs

অনেক কিছু করার প্রবাদের চিত্র। ছবিটির অন্য অংশে মাছ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ছবিটি একজন জেলের যিনি মাছ ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। এটি সম্ভবত To fish behind the net বা সুযোগ হারিয়ে ফেলার প্রবাদের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন অনেক প্রবাদই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে বা পরিবর্তিত হয়েছে। ওনার আঁকা আর একটি বিখ্যাত প্রবাদ সংক্রান্ত ছবি হলো Big fish eat little fish (১৫৫৬)।

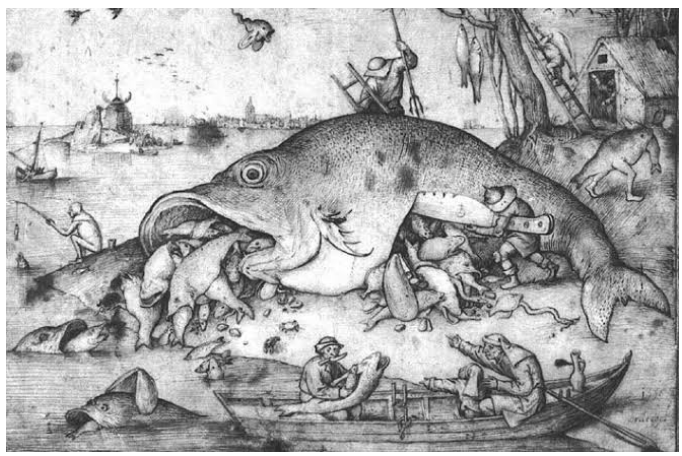

Big fish eat little fish

যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি বিশাল মাছকে মারা হয়েছে এবং জেলেরা তাকে কাটার পর দেখা যাচ্ছে তার মুখ ও পেট থেকে বেরিয়ে আসছে প্রচুর ছোট মাছ। ক্ষমতাশালীদের সাধারণ মানুষদের ওপর শোষণের প্রতীক এই ছবিটি যা আজো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাদের ব্যবহার ছাড়াও এই ছবির লক্ষণীয় ব্যাপার হলো প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণার বাইরে গিয়ে আঁকিয়ের নিজস্বতার বহিঃপ্রকাশ যা আরো সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল গুসেপ্পে আর্কিমবল্ডোর আঁকা Water (১৫৬৩-৬৪) ছবিতে। এই ছবিতে একটি মহিলার মুখের অবয়ব আঁকা হয়েছে কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো সেই মুখ পুরোটাই তৈরী হয়েছে মাছ ও জলজ প্রাণী জগতকে নিয়ে। মহিলা এবং মাছ, উভয়েই সৃষ্টি ও উর্বরতার প্রতীক।

এরপর সময় যতো এগোতে থাকলো ছবির ধারায় যোগ হলো আরো একটি স্রোত, স্টিল লাইফ, যা পরবর্তীতে ইউটিলিটেরিয়ান ধারণায় অনুপ্রাণিত ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে প্রথম দিকে এই স্টিল লাইফ ছবিতেও ছিল ধর্মীয় প্রভাব, যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পিয়েটার ক্লয়েজের আঁকা Still life যেখানে টেবিলের ওপর থাকা মাছ, ওয়াইন, ছুরি, আপেল সবকিছুরই সাথেই বাইবেলের যোগাযোগ সুস্পষ্ট। প্রায়

Water

ওই সময়েই, ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স স্নাইডার Markets নামক একটা সিরিজ আঁকেন যার অন্যতম ছিল Fish Market। এই ছবিতে মাছের দোকানে মাছ বিক্রির সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছিল। এইভাবে আস্তে আস্তে ছবি হয়ে উঠছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি আর যেহেতু মাছে ছিল সাধারণ সেই দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ তাই মাছের ছবিও হয়ে উঠছিল আরো বাস্তবসম্মত।

Fish Market

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় আঁকার ধরণ পাল্টাতে থাকে এবং বারোক, রোকোকো স্টাইলের অনুপ্রেরণায় আঁকা হয়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উদযাপন! তাই আর্থার ডেভিসের আঁকা Portrait of an unknown boy fishing (১৭৪৯), Young man–the young Watonian (১৭৫০) ইত্যাদি আঁকাতে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির

Watson and the Shark

মাছ ধরার ছবি। জন কোপলের আঁকা Watson and the shark (১৭৭৮) ও এই শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত ছবি যেখানে দেখানো হচ্ছে ব্রুক ওয়াটন নামক একটি ছেলেকে হাঙরের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধারের কথা! বর্তমানে এই ছবিটি ওয়াশিংটন ডি. সির ''ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্ট'' এ আছে। মাছের আঁকার ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য বই বোধহয় জার্মান পরিবেশবিদ ও ডাক্তার মার্কাস এলিসার ব্লকের লেখা General Natural History of Fishes (১৭৮২-৯৫) যেখানে উনি অ্যাঞ্জেল, ক্লাউনফিশ, সেইলফিন ট্যাঙ সহ প্রায় ১৭৬ প্রজাতির সামুদ্রিক ও অ্যাকোয়ারিয়াম মাছের ছবি ও বর্ণনা দিয়েছেন। আর্নল্ড ওয়েডেভেল্ড ছিলেন আরেক আর্টিস্ট যিনি নিজে মৎস্য ও পরিবেশপ্রেমী ছিলেন। তাই তাঁর আঁকায় একাধিকবার মাছের ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাটের ছবি উঠে এসছে যার মধ্যে অন্যতম হলো The Fighting Muskellunge (১৮৭৫)। যেখানে উনি ফুটিয়ে তুলেছেন একটা মাস্কি কিভাবে তার স্বাভাবিক বাসস্থানে একটা গ্রীন উইঙ্গড টীল কে শিকার করছে। আরেকটি ছবিতে সামুদ্রিক বাসস্থানে একঝাঁক স্যামনকে সাঁতাররত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ছবিই না, স্টিল লাইফেও উনি স্যামন মাছের ছবি এঁকেছেন।

The Fighting Muskellunge

আর স্টিল লাইফের কথাই যখন হলো তখন হেনরি রলফ এর আঁকা বিখ্যাত ছবি Salmon and Trout (১৮৫৯) এর উল্লেখ তো করতেই হয়। এই সময়ের আরো এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন উইনস্লো হোমার যাকে তার সমুদ্র

এবং ধীবরদের জীবনযাত্রার প্রতি ভালোবাসার জন্য Fisherman painter বলেও ডাকা হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি হলো The Herring net (১৮৮৫) যেখানে তিনি উত্তাল সমুদ্র থেকে হেরিং মাছ ধরার দৃশ্য এঁকেছেন। এই প্রসঙ্গে এই শতাব্দীর আরো একটি বিখ্যাত মাছ ধরার ছবি, ফিলিপ গডউইনের আঁকা Two Fishermen in a Birch Canoe র উল্লেখ করতেই হবে। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষ দিকে থমাস বেঞ্জামিন কেনিংটনের Idle Hours (১৮৯২-৯৬) নামক একটা তৈলচিত্রের কথা বলি বরং যেটা আমাদের মতো মাছ পুষিয়েদের কাছে খুব পরিচিত চিত্র। এই ছবিতে শিল্পী দেখিয়েছেন কিভাবে একজন মহিলা তাঁর অবসর সময়ে জারের মধ্যে পোষা একাধিক মাছের সাথে আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন।

The Herring net

বিংশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন আর্ট ফর্মের সাথে সাথে ছবির বিষয়বস্তু হিসাবেও মাছ বেশ জনপ্রিয় হয়ে পড়লো। সেটা জিওর্জিও ডি চিরিকো-র আঁকা মেটাফিজিকাল ছবি The Sacred Fish (১৯১৮) ই হোক বা ইলিয়া মাসকভ এর আঁকা Still Life সিরিজের Still life with Fish (১৯১০) ই হোক। এই সময় শিল্পী হেনরি মাতিস তো রীতিমতো গোল্ডফিশের প্রেমে পড়ে গেছিলেন। তাঁর গোল্ডফিশ সিরিজের (১৯১২) নয়টি ছবিতে তিনি বিভিন্ন ভাবে গোল্ডফিশদের এঁকেছেন। এই সিরিজের আকর্ষণীয় দিক হলো এর উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার। বিখ্যাত avantgarde ধারার চিত্রশিল্পী পল ক্লী-ও তাঁর The Goldfish (১৯২৫), Around fish (১৯২৬) ইত্যাদি ছবিতে আলো ছায়ার অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন মাছকে কেন্দ্র করে।

The Goldfish

১৯৩১ সালে জন ইভান্স বার্কারের আঁকা Aquarium ছবিতে আমরা অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে থাকা মাছেদের দেখতে পাই। এই সময়ের আমার ব্যক্তিগত ভাবে অন্যতম পছন্দের ছবি হলো নিকোলাস রোয়েরিখের আঁকা A Spell (১৯৪০)। আলো-আঁধারিতে মাখামাখি এই আঁকায় দেখা যায় এক সাধু

A Spell

প্রকৃতির চারটি মূল উপাদান - জল, আগুন, মাটি ও বাতাসকে উপাসনা করছেন আর সেই জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে মাছ। আর আধুনিক চিত্রশিল্পের আলোচনা যাঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, সেই সালভাদর ডালিও মাছেদের ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব সাররিয়াল শিল্পরীতির মাধ্যমে Tuna fishing (১৯৬৬-৬৭)। ছবিতে এই সাররিয়াল ধারা বজায় রেখেই একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নাতালিয়া জডানোভা তাঁর Live bait fishing নামক এক সিরিজে একাধিক ছবি এঁকেছেন মাছের। ২০০২ সালে ডায়না রোম পেবলস এর আঁকা Tarpon Pass আরেকটি বিখ্যাত ছবি যেখানে টারপনের সাথে সাথে তার স্বাভাবিক বাসস্থানেরও একটা সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

Tuna Fishing

কেভিন ব্রান্টের ২০১২-১৩ সালে আঁকা Under the Docklight হলো আরেকটি ছবি যেখানে লাইভ ফিশিংকে দূর্দান্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাররিয়াল হলো, রিয়ালিস্টিক হলো,তাহলে কি এই সময়ে মাছের স্টিল লাইফ আঁকা হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মারিও টের ব্রাকের আঁকা Seven fishes and one pumpkin হলো তার অন্যতম প্রমাণ যেখানে সাতটি মাছ এবং কুমড়োর একাধিক ফালির সহাবস্থানের অসাধারণ ছবি আঁকা হয়েছে। গাঢ় কমলা রঙের কুমড়োর ফালির পশ্চাদপট এবং তার ওপর রূপোর পাতের মতো ঝকঝকে মাছ এই ছবির দৃষ্টিনান্দনিকতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

মাছের আঁকার আলোচনা হবে আর সেখানে চীন ও জাপান আসবে না, সেটা

Under the Docklight

হতেই পারে না। এই দুই দেশের ধর্ম, চিন্তা ভাবনা, সংস্কৃতি সবকিছুতেই মাছ এতোটাই জড়িয়ে যে এখানকার ছবিতেও মাছের উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। যেমন জাপানে জাপানী কই মাছকে মনে করা হয় সৌভাগ্য ও ধৈর্য্যের প্রতীক। বৌদ্ধরাও মনে করেন এই মাছ সাহসের প্রতীক। তাই গড়ে উঠেছে এক ধারার নিজস্ব শিল্পজাপানী কই আর্ট। চীনেও কই মাছ ও গোল্ডফিশকে সৌভাগ্যের প্রতীক ধরা হয়। Six Fish ও দেশের এক বিখ্যাত শিল্পকর্ম ''ফেংশুই'' আর্টেও মাছের ছবি এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। যেমন একজোড়া সাঁতাররত কইকার্পের ছবির অর্থ বন্ধুত্ব এবং সুখী দাম্পত্যজীবন। নয়টি কার্প বা গোল্ডফিশের ছবি আবার সৌভাগ্যের প্রতীক। তেমনই বিশ্বাস করা হয় আরোয়ানা, বিশেষ করে গোল্ডেন আরোয়ানা মাছের ছবি বয়ে আনে ধন সম্পদ এবং ক্ষমতা!

Six Fish

জাপানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একধরণের ফিশ আর্ট প্রচলিত আছে যার নাম Gyotaku (Gyo মানে মাছ আর Taku মানে পাথরের ওপর ছবি।) প্রথমদিকে মাঝিরা তাদের ধরা মাছেদের হিসাব রাখার জন্য মাছ ধরে পাথরের ওপর ছাপ দিয়ে রাখতেন। পরে এটাই আর্টে পরিণত হয়। সুমি কালি দিয়ে ওয়াশি কাগজের ওপর এই ছবি ''আঁকা'' হয়। এমনকি জাপানী সামুরাইরা তাঁদের মাছ ধরার প্রতিযোগিতায় এভাবেই হার-জিতের হিসেব করতেন। বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে এই আর্টও যে সাদা-কালো ছাপ থেকে রঙিন হয়েছে সে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধুমাত্র কাগজের ওপরেই নয়, সেরামিক প্লেটের ওপরেও যে মাছের ছবি আঁকা হয় তার প্রমাণ ১৯৮২ সালে জাপানের শিরো ইকেগাওয়ার সেরামিক প্লেটের ওপর আঁকা Brown Trout ছবিটি।

Gyotaku painting

বিশ্বভ্রমণ তো হলো, এবার নাহয় একটু চোখ রাখা যাক আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের সাথে মাছের সম্পর্ক কতোটা গভীর তার একটা দলিল হলো ভারতের বিভিন্ন লোকচিত্রে মাছের অবস্থান। আর লোকচিত্রে মাছ বলতেই যেটা আমাদের মনে আগে ভেসে ওঠে সেটা হলো আমাদের দেশের মধুবনী পেন্টিঙ। শুধু মধুবনীই নয়, বাংলা ও ওড়িশার পটচিত্রতে এবং গোন্দ শিল্পেও মাছের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

মধুবনী ছবিতে মাছ

এই ধারার চিত্রকররা মনে করেন যে মাছ হল উর্বরতা এবং উন্নতির প্রতীক।

প্রকাশ কর্মকারের আঁকা ছবিতে মাছ

মাছের উপস্থিতি এটা প্রমাণ করে যে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান সঠিক ভারসাম্যে আছে। তাই এনারা তাঁদের আঁকায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় একাধিক মাছের ছবি ফুটিয়ে তোলেন বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে। যামিনী রায়ের আঁকা কয়েকটি ছবিতেও বিড়ালের মুখে মাছ বা নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নৌকার সাথে মাছের ছবি দেখা যায়। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর ছবিতে আমরা দেখতে পাই দেশীয় মাছের

নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিতে মাছ

অনবদ্য স্কেচ। আর সাথে তাঁর সেই অনন্য ছবি যেখানে বনের বাঘ ও জলের মাছের সহাবস্থান দিচ্ছে সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের বার্তা। শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের তুলিতে ফুটে উঠেছে মাছ বিক্রেতার ছবি। এছাড়াও বর্তমান প্রজন্মের বিভিন্ন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ যেমন চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, কুনাল বর্মন, তৌসিফ হক এনারা এনাদের ক্যানভাসে নিজস্ব শিল্প-ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলছেন মাছের ছবি।।
প্রাচীন কাল থেকে দেশ বিদেশের বিভিন্ন চিত্রকলার বিভিন্ন চিত্রশিল্পীদের সৃষ্টিতে মাছেদের এই উপস্থিতি আমাদের উপলব্ধি করায় যে মাছ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে কতোটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম মাছশিকারী জনগোষ্ঠীর সাথে আজকের উন্নত মানবসভ্যতার ব্যাপক তফাৎ ঘটে গেলেও মাছের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, নির্ভরশীলতার তফাৎ খুব একটা ঘটেনি। এই আশা নিয়েই এই লেখার ইতি টানবো যে ভবিষ্যতেও যেন মানুষ এই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মাছেদের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাকে তার স্থানীয় জলাভূমিতে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এই জীবজগতের সবথেকে বুদ্ধিমান ও যুক্তিশীল প্রজাতি হিসাবে সবাইকে নিয়ে চলার দায় কিন্তু আমাদেরই।

চিত্র সূত্র - ইন্টারনেট।

For Creation and Maintenance of Natural Pond, Artificial Pond, Lily Pool, Koi Pond and other Aquascapping, Landscaping, creation of Urban Forest, Orchard, Kitchen Garden, Roof Garden

Contact

BioMates

6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9477275731

BioMates

for a beautiful world

sundarban
Delta Eco Tourism

For Wildlife Tour, College Excursion and Nature Study Camp in Sundarbans

Phone & WhatsApp - 9433669080.

।। জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনজাতির মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি।।

রাকেশ সিংহ দেব

ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গভূমির (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) অন্তর্গত ছোটনাগপুর (মতান্তরে 'চুটিয়া নাগপুর') মালভূমির জঙ্গলাকীর্ণ জমিদারি এলাকা বা মহাল' স্থানীয়ভাবে উচ্চারিত হয়ে নাম নিয়েছে 'জঙ্গলমহল'। এই নামটি নিয়ে অনেকের মধ্যে অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হলেও মনে রাখতে হবে, জঙ্গলমহলের মানুষ জংলি নয়, এখানকার মানুষজন প্রকৃত অর্থে প্রাকৃতির সন্তান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনধারার চর্চার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিমুখী। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে রয়েছে শিকড়ের টান, মননে রয়েছে পরম্পরায় চলে আসা এক অভিন্ন সংস্কৃতির প্রবাহ। বিশ্বায়নের যুগেও নিজের অস্তিত্বকে নতুন করে চিনে নেওয়ার প্রচেষ্টা। জঙ্গলমহল এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সিংহভাগ হল বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বেশীরভাগ টোটেমিক আদিবাসী। এই টোটেমিক আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রয়েছে একাধিক গোষ্ঠী। টোটেম হল সেই প্রতীক যা দিয়ে টোটেমিক আদিবাসীদের গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট প্রতীক বা টোটেমগুলি তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। টোটেম-এর ধারণা মানুষের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যেভাবে সুষম যোগসূত্র রক্ষা করে তা আসলে টোটেমিক মানুষজনের মননের মধ্যকার ''সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব'' -এর উপস্থিতির বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ''সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্ব'' -এর মূল বিষয়বস্তু হল আমরা সবাই প্রকৃতির সন্তান এবং প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে আত্মা এবং আত্মিক মেলবন্ধন। এই টোটেমিক বিশ্বাস শুধুমাত্র সমাজসংস্কৃতি, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের পরিচয় বহন করেনা, এটা প্রকৃতির সাথে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক সহাবস্থানের বার্তা দেয়। টোটেম কেবল নিরীহ বা হিংস্র জীবজন্তুই নয়, উদ্ভিদ থেকে বিশাল বৃক্ষ পর্যন্ত টোটেম হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায়। এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি মাছেরাও। 'মেছোবই' -এর শারদ সংখ্যায় জঙ্গলমহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী কুড়মি জনজাতির বিভিন্ন মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে হয়েছে। এবার রইলো জঙ্গলমহলের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন মেছো সংস্কার ও সংস্কৃতি।

সাঁওতাল: জঙ্গলমহলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ হল সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন অষ্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর বংশধর। জঙ্গলমহলের সর্বত্র এদের বসবাস। সাঁওতালদের প্রায় ১০০টি এর বেশি গোষ্ঠীর বিভিন্ন টোটেমের মধ্যে পশু পাখি ও প্রাকৃতিক

উপাদানের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে মাছ। সাঁওতাল গোষ্ঠী বয়ার (Boyar) এর টোটেম হল মাছ।

মুন্ডা : প্রোটো অস্ট্রেলীয় জাতি গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হল মুন্ডা। মুন্ডারা প্রথমে উত্তর পশ্চিম ভারতে বসবাস করত। পরে তারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে। ক্রমে তারা রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তারা প্রবেশ করে ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলে। মুন্ডাদের মোট ৬৪টি গোষ্ঠীর বিভিন্ন টোটেমের মধ্যে পশু পাখি ও প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে মাছ এবং মাছ ধরার ব্যাপার। মুন্ডা জনজাতির সই (Soi) গোষ্ঠীর টোটেম হল শোল মাছ, বালামচু (Balamchu) গোষ্ঠীর টোটেম হল জাল। এছাড়াও বা (Baa), বোদরা (Bodra) গোষ্ঠীর টোটেম হল বিভিন্ন মাছ।

মাহালি: মাহালিরা ঝাড়গ্রামে ''মাহলি'' বলে পরিচিত। মাহালিরা যে সাঁওতালদের একটি শাখা তার পরিচিতি পাওয়া যায় তাদের গোষ্ঠীনাম থেকে। তবে বর্তমানে ভাষা ও সংস্কৃতিতে সাঁওতালদের সাথে এদের মিল নেই। বাঁশের কাজ এদের প্রধান জীবিকা। মাহালি গোষ্ঠী মুর্মু (Murmu) এর টোটেম হল শাল মাছ।

কোড়া: আদি অস্ট্রাল শ্রেণির আদিবাসী এবং মুন্ডাদের এক বিচ্ছিন্ন শাখা বলে কোড়াদের চিহ্নিত করা হয়। এরা ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী। মাটিকাটা পেশার সাথেই এরা যুক্ত। কোড়ারা অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রতিটি গোষ্ঠীর আলাদা টোটেম রয়েছে। কোড়াদের মধ্যে সমর (Samar) বা শোল মাছ এক পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক। এই মাছ মারা ও খাওয়ার ব্যাপারে কোড়া সমাজে ট্যাবু রয়েছে।

বাগদি : নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে বাগদিরা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডে অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর পাশাপাশি থাকার ফলে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কিছু সংস্কৃতি এদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এদের মূল জীবিকা মাছ ধরা।

লোধা: লোধারা আদিম আদিবাসী (Primitive tribe) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের যে তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে প্রিমিটিভ ট্রাইব বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র লোধারাই পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় বেশি সংখ্যায় বাস করে। ''লোধা'' শব্দটি এসেছে ''লুব্ধক'' থেকে। ঝাড়গ্রাম জেলায় লোধাদের সবচেয়ে বেশি বসতি নয়াগ্রাম ব্লকে। জঙ্গল সংলগ্ন ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘরে লোধারা বাস করে। জঙ্গলের পশুপাখি, বুনোওল, কন্দ এদের প্রধান খাদ্য। টোটেমিক লোধাদের নয়টি গুষ্ঠি পাওয়া যায়, যথা ১) তুক্তা ২) মলিনা ৩) কোটাল ৪) নায়েক বা লায়েক ৫) দিগর, ৬) পরামানিক ৭) দন্ডপিট ৮) আহরি, ৯) ভূঁইঞা। সুলেখিকা মহাশ্বেতা দেবী লোধাদের জীবনযাত্রা তাঁর লেখায় সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লোধাদের টোটেমের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে মাছসহ অন্য জলচর প্রাণী।

দিগর	**শুশুক**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।
ভূঁইঞা	**শোল মাছ**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।
নায়েক বা লায়েক	**শাল মাছ**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।
আড়ি বা আহরি	**চাঁদা মাছ**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।

খাড়িয়া: আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত উপজাতি। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ রাসেল সাহেবের মতে খাড়িয়ারা। মুন্ডাদের বড় ভাইয়ের বংশধর। প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, ময়ূরীর ডিম থেকে খাড়িয়া জাতির জন্ম হয়। খাড়িয়াদের টোটেমের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে মাছ।

ডুংডুং	**পাঁকাল মাছ**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।
হাঁসদা	**পাঁকাল মাছ**	মারা নিষেধ ও খাওয়া নিষেধ।

ভূমিজ : ''ভূমিজ'' কথাটির অর্থ 'ভূমি থেকে জাত যে'। মাটির সাথেই এদের সম্পর্ক। প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর এই জাতিটি একদা মুন্ডাদের সাথে ছিল বলে পন্ডিতগণ মনে করেন, পরবর্তীতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়। এদের গোষ্ঠী এবং সংস্কারগুলি এদের পূর্ব পরিচয় বহন করে চলেছে। ভূমিজ গোষ্ঠী গুলগু এর টোটেম হল শাল মাছ।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির টোটেম আসলে তাদের জীবনযাত্রার সাথে প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই টোটেম-এর ধারনা তাদের সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পশু পাখি এবং প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যবর্তী সম্পর্কগুলির সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে। টোটেমিক জনজাতির মানুষজনের তাদের টোটেম-এর প্রতি এই গভীর আস্থাশীলতা বা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই টোটেম-এর ধারণা আসলে আধুনিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ধারার প্রাথমিক সহজপাঠ। মুক্তমনা জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা যার পাঠ পেয়েছিল প্রকৃতির পাঠাশালায়। বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের দাপটে যখন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক লোকায়ত সংস্কৃতিগুলি ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়ছে তখন জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনজাতিগুলির নিজস্ব সামাজিক অনুশাসন এবং স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজও জিইয়ে রেখেছে এখানকার জীবনধারার পুরোনো আমেজ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত নস্টালজিয়ার যোগসূত্র!

ছবি: লেখক

।। আগামীর মেছো।।

স্বচ্ছতোয়া বর-৭ বছর, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, ক্লাস—২

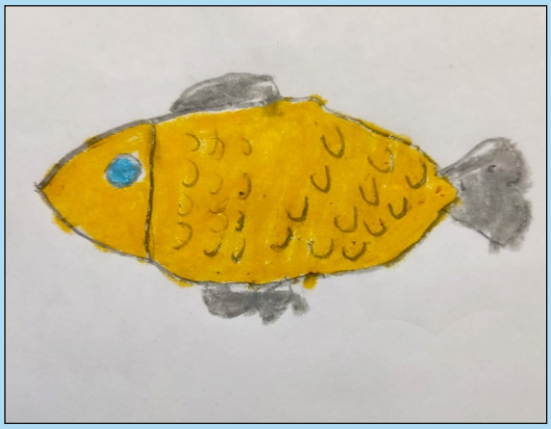

শ্রীতমা মণ্ডল, ৪ বছর

অঞ্জিষ্ণু সরকার, ৬ বছব, সাউথ পয়েন্ট, ক্লাস—১

সোমদত্তা ভট্টাচার্য, ৭ বছর, ভিশন ইন্টারন্যাসনাল স্কুল, ক্লাস—১

শ্রীনিকা মুখার্জী-৬ বছর, লরেটো কনভেন্ট, আসানসোল. ক্লাস—১

।। হ্যামিলটন বুকানন: ভারতীয় মাছের নামকরণের ইতিকথা।।

শ্রয়ণ ভট্টাচার্য

মেটিয়াবুরুজের মহলে তখন তুমুল ব্যস্ততা। মহলের বারান্দা থেকে তার সাধের ''চিড়িয়া ঘর''-কে দেখছেন লক্ষ্ণৌ-এর বৃদ্ধ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। একে একে কত পাখি, জন্তু-জানোয়ারকে খাঁচায় চালান করা হচ্ছে। গর্ভনর ওয়েলেসলির ইচ্ছানুয়ায়ী এদের নতুন ঠিকানা হবে ব্যারাকপুর, কলকাতা থেকে দুরের এক চাঁদমারী এলাকা। গঙ্গার পাড়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে গর্ভনরের সাধের বাগান,পরাধীন ভারতের প্রথম চিড়িয়াখানা। ব্রিটিশ গর্ভনরদের মধ্যে ওয়েলেসলি হলেন প্রথম যিনি বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণশালা নির্মাণে উদ্যোগী হন। তবে প্রকৃত অর্থে এইগুলো সবই গড়ে উঠেছিল তখনকার মাতব্বরদের সুখ পরিবেশনের স্বার্থে। যাইহোক,একদিকে যেমন নতুন চিড়িয়াখানা তৈরীর কাজ চলছে। অন্যদিকে শিবপুরের কাছে তখন গড়ে উঠেছে এক সুবিশাল উদ্ভিদশালা। রক্সবার্গ সাহেবের হাতে যেন জাদুর ছোঁয়া পেয়েছে একদা থানে দূর্গ এলাকা। এই সময়, সালটা ১৮১৪-র কাছাকাছি রক্সবার্গ সাহেবের উত্তরসূরি হয়ে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সাথে এক নতুন সাহেব। নাম ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে যিনি এসেছিলেন ব্রিটিশ আর্মির সার্জেন ওরফে সুপারিনটেন্ডন্ট হয়ে। সদ্য রয়াল সোসাইটির ফেলো হ্যামিলটনের ভারতে আসা কেবলই যে কাকতালীয় ছিল তা বলা যায় না। পরাধীন ভারতের প্রথম উদ্ভিদ ও প্রাণীর শনাক্তকরণ এবং তাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরমপিতা স্বরূপ। বর্তমানে যারা ভারতের মৎস্য গবেষণার কাছে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কাছে হ্যামিলটন সাহেবের নাম চিরপরিচিত। ফ্রান্সিস ডে সাহেবের পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই ভারতের বিপুল মৎস্য ভান্ডার স্বীকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

হ্যামিলটনের সূচনার দিনগুলি:

ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৬২-এ সেন্ট্রাল স্কটল্যান্ডের স্টার্লিং কাউন্টির বারডোইয়ের এস্টেটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৭৭৯ সালে ১৭ বছর বয়সে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক হওয়ার পর, ফ্রান্সিস এডিনবার্গে মেডিসিন অধ্যয়ন করেন এবং ১৭৮৩ সালে তাঁর ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর ১৭৯৪ সালে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়ে তখনকার বাকি সাহেবদের মতোই তিনি ভারতে ব্রিটিশ আর্মির চিকিৎসক হিসেবে আসেন। ভারতে থাকার সময় থেকে আঞ্চলিক জীববৈচিত্রের ওপর এক বিশেষ ভালবাসা তৈরী হয় হ্যামিলটনের। ১৭৯৪ সালে বেঙ্গল রেজিমেন্ট যুক্ত হয়েই তার পরবর্তী সময় বার্মা (বর্তমানের মায়ানমার) সফরে রওনা হন তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের কাজ। এরপর বার্মা থেকে ক্যাপ্টেন সিমসের সঙ্গে মহীশূরে চলে আসেন তিনি। তখনও ইন্দো-মহীশূরের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ শেষে হ্যামিলটনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব তৈরী করতে। এই সময় ভারতে প্রথম উদ্ভিদ ধ্বংসের রিপোর্ট ইংল্যান্ডের পাঠান হ্যামিলটন। তার রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধের জন্য বহু নেটিভ গাছের ধ্বংস হয়েছে এবং পরবর্তীতে তিনি সেই সব গাছের পাতা, ফল, ফুল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য লোকবল নিয়োগের আর্জিও করেন। যদিও তার আর্জি তৎকালীন কর্তৃপক্ষ মেনে নেননি। তবে হ্যামিলটন থেমে যাননি। তিনি স্থানীয় লোকেদের নিয়ে বেশ কিছু গাছের লিনিয়ান ট্যাক্সোনমির কাজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর, স্থানীয় শিল্পীদের সহায়তায় তিনি সেই সব গাছের রঙিন চিত্র অঙ্কন করান। ভাগ্যক্রমে তার লেখা রিপোর্ট এসে পৌছয় ওয়েলেসলির হাতে। এবার আর কপালে অপমান জুটল না। এক প্রকৃতি প্রেমিক আর এক প্রকৃতিপ্রেমীকে চিনে নিলেন অনায়াসে। পুরস্কার স্বরূপ হ্যামিলটন কে পাঠানো হল নেপাল এবং গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের জীববৈচিত্রের সুমারি করার জন্য।

বঙ্গীয় সুমারি:

হ্যামলিনের বঙ্গে আগমনের সময়টি মোটেও শান্তিপূর্ণ ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ওয়েলেসলির ওপর জেমস পন্স সাহেবের আক্রমণ তখন কর্তৃপক্ষের কাছে সবচেয়ে মাথা ব্যাথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গের এই প্রকার রঙ্গ দেখে হ্যামিলটন তড়িঘড়ি মহীশূর এবং নেপাল থেকে তার আনা তথ্যসমূহের বিস্তারিত বিবৃতি লিখে ফেললেন। বন্ধু জেমস স্মিথের সহায়তায় সেই বিপুল তথ্যভাণ্ডার বই আকারে প্রকাশিত হল, তিনি বইটির নাম দিলেন ''Exotic Botany''। কিন্তু এই বইটিই যে তার আগামীর পথ প্রশস্ত করবে তা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেননি হ্যামিলটন। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দায়ভার বহনের জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজছিলেন ওয়েলেসলি। কারণ নানাবিধ রোগে জর্জরিত রক্সবার্গ সাহেবের পক্ষে আর এই দায়ভার বহন করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। হ্যামিলটনের এই বইটি হাতে আসতেই তিনি সত্তর তার সাথে যোগাযোগ করলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হলেন হ্যামিলটন। এই পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই বঙ্গ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভিদ ও প্রাণী নমুনা শনাক্তকরণের কাজ শুরু করেন তিনি। মৎস্য বিজ্ঞানের তার অবদান আজও অগ্রগণ্য। গাঙ্গেয় অববাহিকা জুড়ে প্রায় ২৭১ টা মাছের নমুনা সংগ্রহ ও তাদের ট্যাক্সোনমিক নাম প্রদান করেন তিনি। বেশিরভাগ স্বাদু জলের মাছের নাম হ্যামিলটন সাহেবেরই প্রদত্ত যা আজও ব্যবহার করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, উদ্ভিদ নমুনার অনুরূপভাবে তিনি মাছের চিত্র বা মনোগ্রাফ অঙ্কন করান স্থানীয় লোকের দিয়ে। এই মনোগ্রাফগুলো পরবর্তীতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থান পায়। তার সাথে গড়ে উঠে ভারতীয় মৎস্য বৈচিত্র্যের এক আন্তর্জাতিক পরিচিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে যারা মৎস্য গবেষণার সাথে যুক্ত বা মৎস্য অনুরাগী তারা প্রায়শই মাছের বিজ্ঞানসম্মত নামের ক্ষেত্রে কিছু সময়ে ''Hamilton'' এবং কিছু স্থানে ''Hamilton buchanan'' এই দুই ধরনের লেখাই দেখতে পান। বস্তুত, ১৮১৮ সালে হ্যামিলটন তার নাম থেকে ''Buchanan'' শব্দটি নিজেই বাদ দেন। কারণ এটা ছিল তার পৈতৃক নাম। তার বাবা মারা যাবার পর তিনি স্ব-ইচ্ছায় তাঁর নাম পরিবর্তন করেন।

তথ্য ও চিত্র ঋণ:

1.Antonia M.V. (1986): Imperialism, Botany and Statistics in early Nineteenth-Century India: The Surveys of Francis Buchanan (1762–1829). Modern Asian Studies. 20, 4 (1986), pp. 625-660. DOI: 10.1017/S0026749X00013676.

2. HORA L. S. AN AID TO THE STUDY OF HAMILTON BUCHANAN'S" GANGETIC FISHES. Memorise of the Indian Museum.

3. Hamilton, F. and Britz, R.(2019).Francis Hamilton's Gangetic Fishes in Colour. Ray society.

4. Francis Buchanan-Hamilton. https://memim.com/francis-buchanan-hamilton.html.

কুমকুম বুটিক

Be exclusive Be Devine

Be traditional with ethnic

Saree • Blouse • Jewellery

Wholesale and Retail

Contact : 9432694151

Kumkum boutique

।। বায়োফ্লোক টেকনোলজি: মাছ চাষের এক নতুন উদ্ভাবনী আবিষ্কার।।

দেবায়ন চ্যাটার্জী

রমেশ বাবু রিটায়ার্ড পার্সন। রোজ ভোরে উঠে প্রথম সকালের বাজারে তার হাজিরা থাকবেই। কারণ তিনি মনে করেন সকালে না গেলে টাটকা মাছের আর কিছুই বাকি পরে থাকেনা। যা থাকে তা ভিন রাজ্যের চালানী মাছ। কালকেও তিনি যথারীতি বেরিয়েছিলেন এবং তাতে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। তাঁর দুটো বাড়ি পরে থাকে পাড়ার ছেলে তানজিল। সে ছেলে কিনা বড়ো দুখানা ড্রাম সমেত মাছ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। রমেশ বাবু আর থাকতে না পেরে তার কাছে গিয়ে বললেন -

-হ্যাঁরে তোর কাছে এগুলো কি মাছ আর পেলি বা কোথায় ?

-ও কাকা, এ তো পাবদা আর কই মাছ। এই বাজারে নিয়ে যাব। তুমি নেবে নাকি ?

-পাবদা আর কই ? কিন্তু তুই মাছ চাষ করলি কোথায় রে ? এ পাড়ায় তো পুকুর ই নেই।

- আহা কাকা, তোমরা এখনো কিছু জানো না, এখন মাছ চাষ করতে গেলে আর পুকুর লাগে না গো, বাড়িতে অল্প জায়গা থাকলেই করা যায়। সে উঠনই হোক, বা বাগানে কিংবা ছাদে।

-বলিস কি রে, বাড়ির উঠোনে মাছ চাষ ? এ কি সম্ভব। আর সে মাছ খেতেই বা কেমন হবে ?

- কেন হবে না। আমি তো বায়োফ্লোক টেকনোলজিতে মাছ চাষ করি। অল্প জায়গা থাকলেই এখানে মাছ চাষ করা যায়। আর তুমি এই মাছ খেয়েই দেখনা। কেমন টেস্ট। পরে বেলার দিকে আমার ফার্মে ঘুরে যেও ।

- এই বলে তানজিল রমেশ বাবুর ব্যাগে এক কেজি পাবদা আর এক কেজি কই মাছ দিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ায়।

দুপুরে পাবদা মাছের ঝাল খেতে খেতে রমেশ বাবুর মনে পড়ে ছেলেটার কথা। কি যেন বলেছিল। বায়োফ্লোক ? বাড়ির উঠনেই মাছ চাষ করা যায় ? কি দিন কাল এল বাবা, এত টেস্টি মাছ বাড়ির উঠানে। ভাবা যায় ? এতো যাকে বলে দুয়ারে মাছ চাষ। যাহোক কিন্তু ব্যাপারটা তো আরো ভালোভাবে জানতে হচ্ছে। খেয়ে উঠেই রমেশবাবু ফোন করেন তার বন্ধুর ছেলে তুহিনকে। সে মাছ চাষ নিয়ে ভুবনেশ্বর না কোথা থেকে রিসার্চ করেছে। তাকে বিষয়টি বলতেই তুহিন হেসে বলে

-ভালো লোকের কাছেই তুমি জিজ্ঞেস করলে আঙ্কেল। তিন বছর ধরে এটার ওপরেই রিসার্চ চলছে আমাদের টিমের।

- কিন্তু তুহিন, মাছ চাষ করতে তো অনেক জলের দরকার বিদেশে দেখেছি বিভিন্ন মেশিন দিয়ে জল পরিষ্কার করে তাও অপচয় ও হয়।

-হ্যাঁ আঙ্কেল, ঠিকই দেখেছ। কিন্তু এখানেই বায়োফ্লোকের সাথে বাকি টেকনোলজি গুলির তফাৎ। অলমোস্ট জিরো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ হয় এখানে, সাথে মাছের খাদ্যের খরচও কমে। আচ্ছা দাঁড়াও তুমি কাল আমার বাড়ি চলে এসো। এখানে আমার ফার্মেই পুরো ব্যাপারটা তোমায় দেখাব।

রমেশ বাবু ছাত্র জীবনে জীববিদ্যার বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এ বিষয়ে তার আগ্রহ বরাবরই ছিল। তাই তুহিনের ইনভাইটেশন পেয়ে দেরি না করে সকালেই ওর বাড়ি চলে গেলেন। তুহিনের বাড়ির পেছনে বেশ বড় ৫ টা ট্যাংক। তুহিন বললো এগুলি ২০ হাজার লিটারের টারপোলিন ট্যাংক। বর্তমানে পাবদা, কই আর সিঙ্গি চাষ করছে। একটা নেট দিয়ে ট্যাংক থেকে এক ঝটকায় কিছুটা কই মাছ ধরে বললো

- দেখ আঙ্কেল, বাড়ির উঠনেও মাছ চাষ হয়।

রমেশ বাবু বললেন,

- সত্যি অসাধারণ। কিন্তু তুহিন তুই আমায় এই বায়োফ্লোক টেকনোলজি সম্পর্কে বল।

মাছ চাষ পৃথিবীর এক আদিম পেশা। মিশরের পিরামিডের আমলেও তেলাপিয়ার হদিস মিলেছে। কিন্তু সেকাল আর একালের মধ্যে বিস্তর ফারাক। মানুষ যত উন্নত হয়েছে ততই প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে। আশেপাশের জলাভূমি বুজিয়ে নির্বিচারে গড়ে তুলেছে নিজের বাসস্থান। ফলে জীব বৈচিত্র্য হয়েছে বিপন্ন। অনেক দেশীয় মাছই আজ বিলুপ্তির পথে। যতই জনসংখ্যা বেড়েছে ততই বেড়েছে খাদ্যের চাহিদা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সব থেকে বেশি ভুগছে এই খাদ্য সংকটে। প্রোটিনের অভাবে আফ্রিকার দেশ গুলিতে আজও শিশু মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যদি মাছের উৎপাদন বাড়ান যায় তাহলে এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রোটিনের ঘাটতি কিছুটা কম হতে পারে।

কিন্তু সমস্যা দেখা গেল এক জায়গায়। জলাভূমির সংকট, বিশেষ করে মিডল ইস্ট এর দেশগুলিতে তো জলের আকাল চলে। মাছ চাষ করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন এটা কম বেশি সবাই জানে। প্রাকৃতিক ভাবে মাছ চাষের জন্য দেশের জলাধার তো আছেই। কিন্তু কৃত্তিম ভাবে মাছ চাষের জন্য যে কয়েকটি পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে রি সার্কিলুটেরি একুয়াকালচার সিস্টেম বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানেও সমস্যা ছিল। জল ফিল্টারের জন্য যে মেকানিজম গড়ে উঠল তা অনেকটাই ব্যায়বহুল এবং এখানেও প্রচুর জলের অপচয় হতে লাগলো, এছাড়াও মাছ চাষের খাদ্যের খরচ বাড়তে থাকে।

বিজ্ঞানীরা এরপর আরো গবেষণা করেন। লক্ষ্য ছিল মাছ চাষের জন্য জলকে পুনরব্যবহার করা, কম খরচে একটি সিস্টেম গড়ে তোলা এবং মাছ চাষের খাদ্যের খরচ কমান। গবেষণা ফলশ্রুতিতে তাঁরা আরো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার নাম দেয়া হয় 'বায়োফ্লোক'। ১৯৭৯-৮০ এর দশক থেকে কাজ হলেও ইজরায়েল এক বিজ্ঞানী যাঁর নাম ইওরাম অভনীমালেক তিনিই সবার সামনে বায়োফ্লোক পদ্ধতির একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। এবং বলা যায় তার এই আবিষ্কারের ফলে উচ্চ ঘনত্বে মাছ চাষের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

এখন কথা হলো এই টেকনোলজি কিভাবে কাজ করে ? আমরা জানি মাছ যখন জলে থাকে তখন সে শরীর থেকে বর্জ্য (ওয়েস্টেড) পদার্থ বের করে যা জলে মিশে যায়। আবার খাবারের অবশিষ্টাংশ যখন জলে মিশে যায় তার থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়, যা মাছের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই যারা একুয়ারিয়ামে মাছ রাখেন তারা বেশি অ্যামোনিয়া হলে কিছুটা জল পাল্টে দেন। কিন্তু বায়োফ্লোকে এই জল পরিবর্তন ছাড়াই অ্যামোনিয়া কন্ট্রোল করা সম্ভব জৈব উপকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা। এর ফলে আমাদের জল না পরিবর্তন করলেও মাছ চাষ করা সম্ভব হয়ে যায় ছোট পরিসরে। এখানে আরো একটা ব্যাপার ঘটে। ব্যাকটেরিয়া যখন এমনিয়া কে ধ্বংস করে তখন তারা সেটিকে মাইক্রোবায়াল

প্রোটিন সেলে কনভার্ট করে দেয়। এটি আবার মাছের খাদ্য রূপে বিবেচ্য হয়। তাই আমরা এক খাদ্য মাছ কে দুবার খাওয়াতে পারি ফলে মাছ চাষের খরচ ও কমে।

-কিন্তু তুহিন এভাবে চাষ করলে কোনো রিস্ক বা সমস্যা থাকে কি?

-দেখ আঙ্কেল, তুহিন বলে, এটা পুরোপুরি টেকনোলজি তাই বলতে পারো পুরোটাই বিদ্যুৎ নির্ভর। আমরা যখন ছোট জায়গায় মাছ চাষ করি অধিক ঘনত্বে তখন তাদের অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য এরেটর ব্যবহার করতে লাগে, যা ২৪ ঘন্টা চালাতে হয়। যার জন্য একটি পাওয়ার ব্যাকআপ এর দরকার পড়ে। আর মাছ গুলিকে একটু যত্ন তো করতেই হয়।

-আর এই মাছ চাষ লোকালয়ের মধ্যে করলে কি কোনো সমস্যা হবে যেমন মাছের বা জলের গন্ধ এই সব?

-আঙ্কেল, তুমি তো নিজেই আমার ফার্মে এসে ট্যাঙ্কের পাশে বসে আছ কোনো গন্ধ পাচ্ছ কি? ঠিক ভাবে জল কে মেন্টেন করলে এসব কোনো সমস্যাই হবে না।

-আচ্ছা তুহিন, কি কি মাছ এই ভাবে ট্যাঙ্কে করা যায়?

-বায়োফ্লোকে মূলত তেলাপিয়া আর ভেনামি চিংড়ির উপর এ কাজ হয়েছিল। কিন্তু এখন বর্তমানে পাবদা, কই, সিঙ্গি, দেশী মাগুর এগুলিও সুন্দর হচ্ছে। আর বাজারদর বেশি থাকায় মানুষ অল্প জায়গায় করে লাভবান ও হচ্ছেন।

-তাহলে তুই বলছিস যে কেউ করতে পারে এটা যদি জায়গা থাকে?

-হ্যাঁ আঙ্কেল, যদি কেউ মাছ ভালোবাসে আর কিছুটা সময় দিতে পারে তো অবশ্যই করতে পারে। তবে যেহেতু আমাদের দেশে এটা নতুন, সঠিক ভাবে শিখে বা জেনে তবেই করা উচিত, যে নিজে সফল ভাবে করছে তার থেকেই শেখা উচিত, নাহলে লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। কি আঙ্কেল তুমিও মাছ চাষ করবে নাকি? তুহিন হেসে বলে ওঠে।

তুহিনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরলেন রমেশ বাবু। ভাবলেন তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে খাদ্য চাহিদা মেটাতে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে এই বায়োফ্লোক টেকনোলজি। তেহরানের মরুভূমিতে যেখানে জল পাওয়া যায় না সেখানে গড়ে উঠুক এমন অনেক ট্যাংক সেখানে তৈরি মাছ ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে, কিংবা আফ্রিকায় যেখানে মানুষ এখন একবেলা ভালো করে খেতে পায় না সেখানে মানুষ গুলো দুবেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচুক। কিংবা আমাদের এই বাংলায় যেখানে বাইরে থেকে এত মাছ আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয় সেখানেও তো অনেক বেকার ছেলে মেয়ে এভাবে স্বনির্ভর হতে পারে। রমেশ বাবু ভাবলেন বাড়ির পেছন দিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকাই রয়েছে। একবার দেখবেন নাকি এভাবে মাছ চাষ করা যায় কিনা। আরেকবার তুহিনের কাছে আসতে হবে তাহলে।

এই প্রবন্ধের লেখক দেবায়ন চ্যাটার্জী একজন বায়োফ্লোক অ্যায়াকোয়াকালচার এন্ট্রেপ্রেনার। প্রবন্ধের বক্তব্য এবং মতামত সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব। এক্ষেত্রে 'পাইরেটস ডেন' গ্রুপ এবং 'মেছোবই' সম্পাদকমন্ডলীর কোনো দায় নেই।

ANIMAUX AQUATIQUES

Believe in quality not in quantity

‖ Malawi cichlid ‖ Tanganyikan cichlid ‖ Central American ‖ South American ‖

Wholesale & Retail

Contact details:8910296663

Animaux Aquatiques
@animauxaquatiquesstore

।। পুরাণ কথায় মৎস্য।।

অয়ন ঘোষ

"প্রলয় - পয়োধি - জলে, ধৃতবানসি বেদম; বিহিত- বহিত্র - চরিত্রমখেদম।
কেশব ধৃত - মীনশরীর, - জয় জগদীশ হরে ।।"

"মৎসাবতার" কথার এই শ্লোকটি প্রবিধানযোগ্য। যে বেদে তোমার চরিত্র ভবসাগরে তরুণীরূপে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই বেদকে তুমি প্রলয়ের জলরাশির মধ্যে অনায়সে ধারণ করেছিলে। হে কেশব, হে মৎস্য রূপ ধারণকারী, হে জগদীশ্বর, হে হরি, তোমার জয় হোক।
আমার বলি না, মাছেভাতে বাঙালি। বাঙালির মৎস্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত। ভারতের পূর্ব প্রান্তের এই রাজ্যে খাল-বিল নদীনালা বেশি হওয়ার কারণে মাছের প্রতুলতা চিরকালই আমাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। এখানে গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের মজার ছড়াটি স্মরণযোগ্য -

"ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল/ ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।"

এই কারণে বাঙালীদের যেকোনো শুভ অনুষ্ঠানে মাছ অনিবার্যভাবে উপস্থিত। অন্যদিকে মাছ খেতে পছন্দ করার জন্য গোটা ভারতের কাছে বাঙালি সমালোচিত। অন্য রাজ্যে শুভ কাজেও মাছের উপস্থিতি সেভাবে নেই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মাছ খেতে প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাঙালি ব্রাহ্মণদের বাঁচাতে আসরে নেমেছিলেন বাঘা বাঘা পন্ডিত। স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসদেব কেবল বিশেষ কিছু তিথিতে ও বারে মাছ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। সেগুলোর বাইরে মৎস্য ভক্ষণে কোনো বাধা নেই। অন্য এক স্মৃতিকার, শ্রীনাথাচার্য 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছিলেন বিশেষ তিথি ছাড়া ব্রাহ্মণদের মাছ খেতে বাধা নেই। 'বৃহদ্ধর্ম'পুরাণেও ব্রাহ্মণকে মাছ খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এবার দেখা যাক, কি কি মাছ খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে - রুই, পুটি, শোল ও যেকোন সাদা আঁশ যুক্ত মাছ। বাঙালি ব্রাহ্মণদের মাছ খেতে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য নাকি একটা সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করা হয়েছিল। সেই শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী - ইলিশ, খলসে, ভেটকি, মাগুর ও রুইকে নিরামিষ বলে ধরা যেতে পারে। ভাবুন একবার মৎস্য প্রেম কি প্রবল! কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণকথা, ধর্মতত্ত্ব ও লোকাচারকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব শুধু বঙ্গদেশে নয় সারা ভারতজুড়েই বা যেটিকে প্রাচীন নামে জম্বুদ্বীপ হিসেবে অভিহিত করা হতো সেখানে মাছ বা মৎস্য একটি প্রধান উপাচার। আমাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে ও লোকাচারে শুধু না, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও মৎস্যের উপস্থিতি সনির্বন্ধ। কৃত্তিবাস ওঝা তার রামায়ণের অনুবাদে, রুই ও চিতল মাছের উল্লেখ করেছেন। কবি বিজয়গুপ্ত তার মনসামঙ্গলে লিখছেন -

'মৎস্য কাটিয়া খুইল ভাগ ভাগ/ রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।'

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের একটি পদ আজও বাঙালির হেঁশেলে শোভা পাচ্ছে - সেটি হলো আমশোল। রায় গুনাকর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' এ লিখছেন -

'মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।'

এছাড়া আমাদের বঙ্গদেশে রয়েছে মৃতের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর 'মৎস্যমুখী' নামে একটি প্রথা, যাকে কথ্য ভাষায় আঁশপন্না বলা হয়ে থাকে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' নাটকে ইন্দ্রঘাটের রোহিত মৎস্য একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। সেই মাছই রাজা দুষ্মন্তের নামাঙ্কিত আংটি গিলে ফেলে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ সার্থক করে। যদিও কাহিনীটি ব্যাসদেবকৃত মহাভারতে নেই। এটি একান্তই নাট্যকারের সৃষ্টি। এছাড়া এই যে দাসরাজার কন্যা সত্যবতী ওরফে কালী বা কালিন্দী কুরু বংশের রাজরানী হয়ে হস্তিনাপুরের প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, সেই দাসরাজা কে? - তিনি তো মৎস্যজীবি। সেইরকম একটি কথার অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য - কাহিনী মৎস্য অবতার।
অনেক পণ্ডিতদের মতে আমাদের হিন্দুধর্মে, যে দশবতার কথা বর্ণিত হয়েছে তার পিছনে জীববিবর্তনের তত্ত্বটি সুচারু ভাবে উপস্থিত। দশটি অবতার হলো যথাক্রমে- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। বিজ্ঞান অনুযায়ী প্রথম প্রাণের উৎপত্তি যেমন জলে হয়েছে তেমনি আমাদের প্রথম অবতারও জলজাত। পরবর্তীতে বিবর্তনের পথ ধরে আধুনিক জীবনে প্রবেশ। যাই হোক, আসা যাক মৎস্য অবতারের কাহিনীতে। এই কাহিনীটি অতীব প্রাচীন, সত্যযুগের একেবারে প্রথম দিকের কাহিনী এটি। সে সময় বিবস্বান বা সূর্যের পুত্র আসীন ছিলেন মনুপদে। বিবস্বানের পুত্র তাই তাকে বৈবস্বত নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার আসল নাম ছিল রাজর্ষি সত্যব্রত বা শ্রাদ্ধদেব। প্রাচীন জম্বুদীপের দ্রাবিড় দেশের রাজা ছিলেন তিনি -

"যোহসাবস্মিনমহাকল্পে তনয়ঃ সবিবস্বতঃ
শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাত মনুত্বে হরিণার্পিতঃ।।"

এই কাহিনী শুকদেব বলছেন, রাজা পরীক্ষিৎকে। শাপগ্রস্ত রাজা মানসিক শান্তির জন্য ব্যাসদেবের পুত্র শুকবেদের কাছ থেকে শুনছেন ভাগবত কথা। সেই ভাগবত কথার মধ্যেই রয়েছে মৎস্য অবতারের কাহিনী। আমাদের আঠেরোটি পুরাণের মধ্যে একটি হলো 'মৎস্য পুরাণ' যার শ্লোক সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। আসলে মহাভারতের আদিপর্বে এই পুরান কাহিনীর বেশিরভাগই বর্ণিত হয়েছে অতীত কল্পের অবসান অদূরে। সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মদেব ক্লান্ত। তিনি নিদ্রালু এবং বিশ্রামে যেতে চান। যেহেতু তিনি সৃষ্টির রচনাকার, তাই তার নিদ্রার অবকাশেও তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হতে থাকলো নানা রূপ উপদেশাবলী যা এই সৃষ্টিতে 'বেদ' নামে পরিচিত। হয়গ্রীব নামে একজন দানব, ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত সেই বেদকথা শ্রবণ করে, সেই স্থান ত্যাগ করে, মৃত্যুলোকে গমন করল। শ্রী হরি যখন তথ্য অবগত হলেন, তখন সেই বেদজ্ঞান হয়গ্রীবের কাছ থেকে উদ্ধার করার জন্য এক ক্ষুদ্র মৎস্যের রূপ ধারণ করে মর্ত্যধামে এলেন।
রাজা সত্যব্রত সেইসময় দক্ষিণ দেশের বৃতমালা নদীতে স্নান সেরে তর্পণ করার জন্য দু'হাতের অঞ্জলিতে জল ভরতে যেতেই, সেই ক্ষুদ্র মাছটি তার হাতে অঞ্জলিতে আশ্রয় নিল। রাজা বিরক্ত হয়ে যেই না, সেই মাছ সমেত জল ফেলে দিতে উদ্যত হলেন, সেই মৎস্য রূপীশ্রীহরি তাকে অনুরোধ করলেন, এখানে তাকে না ফেলতে অন্যথায় তার প্রাণ সংশয় হতে পারে। কথা বলা সেই ক্ষুদ্র মাছটিকে দেখে রাজা যারপরনাই আশ্চর্য হলেন। মাছটি তার নামও জানাল, শফরী। সেই মাছটিকে তার কমন্ডুলুতে নিয়ে তর্পণ শেষে রাজা ফিরে এলেন

তার প্রাসাদে। পরদিন প্রভাতে রাজা লক্ষ্য করলেন। কমন্ডুলুতে সেই মাছের আর স্থান অকুলান। সেই মৎস্য রাজাকে অনুরোধ করলে, তাকে যেন একটি বড় স্থানে রাখা হয় যাতে সে আরামে থাকতে পারে। এরপর একে একে কলস, সরোবর, হ্রদ ও নদী সেই মৎস্যের আকার এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে কোথাও তার সংকুলান হলো না। এতে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে রাজা ঠিক করলেন একে সমুদ্রে ছেড়ে আসাটাই শ্রেয় হবে। তখন শরফী, রাজাকে অনুরোধ করলে তাকে যেন রাজা সমুদ্রে না দেন কারন সেখানে হিংস্র সব জলচর প্রাণীরা থাকে। তাই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে। রাজা তখন তাকে বললেন, এই বিশাল রূপ মৎস্য এই ভূলোকে বিরল। আর নিজেকে যে কয়েক দিনের মধ্যে নিজেকে এতো সুবিশাল করে তুলতে পারে, সে সামান্য কেউ না। সেই মুহূর্তে রাজা সত্যব্রতের মনে হলো ইনি বোধহয় মৎস্যরূপী শ্রী হরি। মানব কল্যাণের হেতু এই রূপ প্রহন করেছেন। তিনি শ্রীহরির স্তব শুরু করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী হরি তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মাথায় এক মহাপ্রলয়ে ভূঃ, ভূবঃ ও স্বর্গ এই তিন লোকই জলের তলায় চলে যাবে। সেই মুহূর্তে আমি আমি তোমার কাছে একটি নৌকা পাঠাবো। সেই নৌকায় তুমি সব ধরনের বীজ, একজোড়া করে সব ধরনের প্রাণী, ঔষধি নিয়ে সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে চড়ে বসবে। বাতাসের প্রবল বেগে যখন তোমার নৌকা টলমল করবে, তখন নাগরাজ বাসুকিকে তুমি রজ্জু হিসেবে পাবে আর আসব আমি শৃঙ্গযুক্ত মৎস্য রূপে। সেই রজ্জুটিকে কাছির মতো করে আমার শৃঙ্গের সাথে বেঁধে দিলে তোমার নৌকা সেই প্রলয় সমুদ্রে স্থির থাকবে। এই বলে জলরাশির মধ্যেই অদৃশ্য হলেন সেই মৎস্যরূপধারী ভগবান।

শ্রী হরির কথা মতো, সব জোগাড় করে রাজা সত্যব্রত নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাত দিনের মাথায় সত্যই প্রলয় এলো, এলো সেই বিশালাকার নৌকাও। রাজা সবকিছু নিয়ে সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে তাতে সওয়ার হলেন। এরপর শ্রী হরির কথা মতোই সবকিছু ঘটল। শ্রী হরি, এক অতি উজ্জ্বল মৎস্যের বিশাল রূপ ধরে, পুরাণ বলছে প্রায় নিযুত যোজন, সেই নৌকাকে প্রলয় সাগর পার করিয়ে দিলেন। রাজার কর্তব্য বোধে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী হরি তাকে জ্ঞান, যোগ ও আত্মতত্ত্বের শিক্ষা দিলেন। তারপর সেই হয়গ্রীব দানবকে দমন করে, 'বেদ' উদ্ধার করে দিলেন সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার হাতে। নতুন সৃজনে মেতে উঠলেন ব্রহ্মদেব।

আমাদের পুরাণ অনুযায়ী বেদকে ও প্রথম মানুষ মনুকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রী বিষ্ণু মৎস্য রূপে আবির্ভূত হন। এই অবতারের শরীরের ওপরের অংশ মানুষের ন্যায় ও নীচের অংশ মাছের মতো। এই পুরানকথা আশ্রয় করে আমাদের দেশে 'মৎস্য দ্বাদশী' নামে একটি ব্রত রয়েছে। এটি চলে প্রায় মাসাধিক কাল - কার্তিক মাস থেকে মার্গশীর্ষ মাস পর্যন্ত। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী জলেই শুরু হয়েছিল জীবন আর জীবন প্রবহমান জলের কারণেই। মৎস্য অবতার এসেছিলেন অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে, পুনরায় বৈদিক রীতির পুনরুদ্ধার করতে। মনে করা হয় যে, 'মৎস্য দ্বাদশী' পালন করলে শ্রী বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যায়। তিনি ভবসাগরে নৌকা রূপ জীবনকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে, সঠিক দিশায় পৌছে দেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন সত্যযুগে রাজা সত্যব্রতকে। এই পুজোয় ঘিয়ের সাথে হলুদ মিশিয়ে দীপ জ্বালাতে হয়। জুই ও গাঁদা ফুল দেওয়ার বিধি রয়েছে। ব্যাসনে তৈরি মিষ্টান্ন নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্য করে দেখা এই পুজোয় সবেতেই হলুদ রঙের প্রভাব রয়েছে কারন হলুদ শ্রী হরির খুব প্রিয় রঙ। এই পুজোর মন্ত্র খুবই সহজ - ওঁ মৎস্য রূপায় নমঃ।

দশাবতার তাসে মৎস্য অবতার

শিল্পী— দেবপ্রিয়া সরকার

।। অভিসারী বিবর্তন বা পৃথক যাত্রার এক পরিণাম।।

ঐশিক রায়

আমার ছোটবেলা থেকেই ডাইনোসরদের প্রতি খুব আসক্তি। ঐ সেই জুরাসিক পার্ক দেখা, আর ব্যাস, তারপর নিজের সব ভালোলাগা ভালোবাসা এরা হয়ে যায়। একটু বড় হলাম, একটু পড়াশুনা করলাম, সেখান থেকে বিবর্তনের প্রতি আগ্রহ। বিবর্তন নিয়ে হাজার একটা লেখা আছে। তার মধ্যে অনেক কিছু না পড়লেও অনেক কিছু আবার পড়েওছি। তারপর একটা সময় এই বৃহৎ সরীসৃপ এবং তাদের বিবর্তন এর গল্পগুচ্ছ সরিয়ে আমার মনে জায়গা নেয় মাছেরা। আমার মাছ রাখা শুরু পঞ্চম শ্রেণীতে। দুই ফিটের কাঁচ বাক্সে রেখেছিলাম অসংখ্য বৃহদাকৃতির মাছ যা প্রতিনিয়ত অন্যান্যদের বিলিয়ে দিতে হত,বা খাদ্য এবং খাদককেও নিজের অজান্তেই একসাথে রাখার ফলে রোজ মাছের সংখ্যা কমতেই থাকত। এই কিনে এনে মেরে ফেলা বা দিয়ে দেওয়ার চক্রে থাকতে থাকতে এদের নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম। তারপর একটা লম্বা সময় কাটিয়েছি মাছেদের সঙ্গে, এদের বড় করার সাথে সাথে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করেছি। ইন্টারনেটের যুগ বলে ইন্টারনেট ঘেঁটেছি বহুদিন। মাছ কিনে এনে মেরে ফেলার চক্র থেকে বেরিয়ে এসে মাছেদের জীবন নিয়ে পড়েছি এবং এদের জগতে পুরোপুরি ভাবে নিমজ্জিত হয়েছি। সেটা করতে করতেই আবারও বিবর্তনের সাথে দেখা হয়ে যায়।

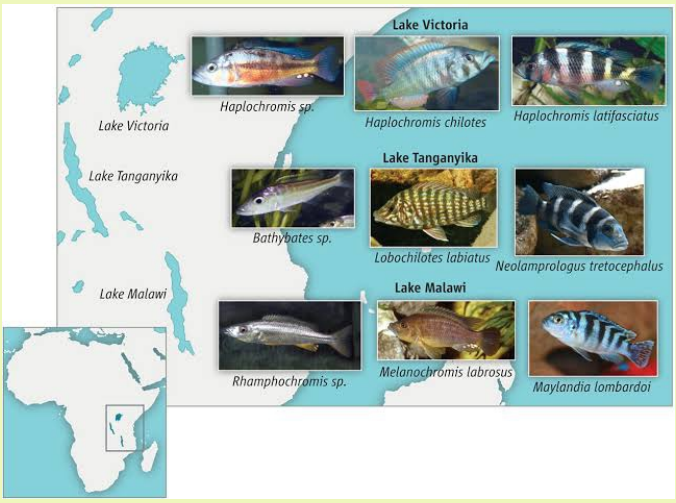

আফ্রিকার ভিন্ন লেকের ভিন্ন প্রজাতির স্বাভাবগত এবং শারীরিক মিল

বিবর্তনের মধ্যে আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিস টা লাগে সেটা হল Convergent evolution বা অভিসারী বিবর্তন। কালের চক্রে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের একই দেহের আকৃতি বা ব্যবহারের মিল দেখা যায়। এর কথা আমরা সবাই কমবেশি জানতে পারি আমাদের পাঠ্য বই থেকে। ওখানেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে লেখাতে analogous এবং homologous দুই ধরনের অঙ্গের কথা জানতে পারি। প্রথমটা বলতে বোঝায় ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ভিন্ন অঙ্গ কয়েক হাজার বা তার ও বেশি বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে এক আকার নেয়। পাখির ডানা এবং পতঙ্গের ডানা এর একটা উদাহরণ। এইরূপ ঘটনার পিছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য কারক, অসংখ্য জীনের অবদান, এবং আমাদের ভাবনাতীত সময়কাল। বিবর্তন একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া, ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। কয়েক কোটি বছরে কম মাংসাশী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েনি। বিবর্তনের দ্বারা এদের সবারই খোঁচা দাঁত বা ধারালো নখ ছিল। মাংসাশী স্তন্যপায়ী বা স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপদের দাঁতের অনেক মিল দেখা যায়। অতীতের Anteosaurus, Inostrancevia, Barbourofelis, Thylacosmilus, Nimravid জাতীয় প্রাণীরা, Smilodon, ও বর্তমানের Clouded Leopard এরা কেউ সরীসৃপ, কেউ স্তন্যপায়ী, কেউ বেড়াল এর জাতভাই আবার কেউ স্তন্যপায়ীদের পূর্বপুরুষ। একে অপরের থেকে এদের সময়ের দূরত্ব লক্ষ থেকে কোটি বছরের ও বেশি। তবুও এদের সবার শ্বদন্ত মুখের তুলনায় বৃহৎ, এবং এরা সবাই মাংসাশী, অর্থাৎ এরা সবাই তথাকথিত Sabre-toothed আজকের শাকাহারী গরু বা অন্যান্য জোড়া-খুঁড় প্রাণীদের পূর্বপুরুষ বা পূর্বপুরুষদের জাতভাইদের মধ্যেও অনেক মাংসাশীদের পাওয়া যায়, যেমন পৃথিবীর সর্বকালের বৃহত্তম মাংসাশী স্তন্যপায়ী Andrewsarchus বা আজকের শুয়োরদের মতন দেখতে Entelodonts যাদের ভালবেসে নরক-শুয়োর ও বলা হয়ে থাকে। আমরা বিবর্তন এর চেয়ে বেশি বিবর্তনের ফলগুলি দেখি, আর মনে করি সেগুলোতেই আটকে গেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া, সেগুলোই প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথচ জলের প্রাণীরা যারা ডাঙ্গায় উঠেও ফিরে গেছে জলে, তারা আবার তাদের জলজ পূর্বপুরুষের আকৃতি ধারণ করেছে, তাই আজও আমরা তিমিকে প্রচলিত ভাষায় তিমি মাছ বলি, যদিও ওরা মাছ নয়, আমাদের মতন স্তন্যপায়ী। তিমি ও শুশুকদের বিবর্তনের আগেও ইকথিওসরাস নামের প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপও বিবর্তনের ফলে টুনা বা হাঙ্গরের মতন আকার নিয়েছিল। মোসাসরাস নামের সরীসৃপরা, যারা আমাদের বর্তমান গোসাপের আত্মীয়, এদের পথ অবলম্বন করে জলে ফিরে গেছিল।

অন্যান্য প্রাণীদের কথা তো হল, এবার আসি মাছেদের কথায়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু উভয় জায়গাতেই দেখা মেলে অনেক মাছের। ওখানকার উপশুন্য তাপমাত্রাতেও এদের বেঁচে থাকতে কোন অসুবিধে নেই। তার কারণ এদের রক্তে একটি বিশেষ রাসায়নিক থাকে, যা antifreeze এর কাজ করে। এই রাসায়নিক উভয় ক্ষেত্রেই বিবর্তিত হয়েছে একে অপরের অজান্তেই। আবার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দুটি খুব আলাদা ধরনের মাছ করতে পারে। দক্ষিণ অ্যামেরিকার Electric eels ও তার আত্মীয়রা এবং আফ্রিকার Mormyrid গোত্রের মাছেরা। দ্বিতীয় গোত্রের মধ্যে পরে আমাদের পরিচিত Baby Whale, Freshwater Dolphin এবং Elephant-nose মাছেরা। আবার দেহের আকৃতির দিক থেকে দেখলে দক্ষিণ অ্যামেরিকার Electric eels ও তার আত্মীয়রা আমাদের চিতল ও ফলুইদের মতন ঘুড়ির আকার নিয়েছে, উভয়ের পিঠের পাখনা ছোট হয়ে গেছে বা লোপ পেয়েছে, এবং পায়ু পাখনা পেট থেকে লেজ অবধি লম্বা হয়ে গেছে। যেকোনো দেশের মাংসাশী catfish-রা লম্বা শুড় ধারণ করে, এবং ওদের দেহ অনেক streamlined হয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকার Pimelodid (Shovelnose, Redtail, Pictus, Dorado Catfish ইত্যাদি) এবং এশিয় Bagrid (আর বা Asian Shovelnose, Asian Redtail, ট্যাঙরা, রিঠে ট্যাঙরা বা Whale Catfish ইত্যাদি) দের দেহের আকৃতি প্রায় একরকমের, এবং এরা সবাই মাছমাংস খেতে পছন্দ করে। Siluridae গোত্রের ভারতীয় বোয়াল Wallago, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার Belodontichthys, Wallagonia, Phalacronotus এবং পূর্ব

এশিয়া ও ইউরোপের Silurus সবাই বৃহদাকৃতির মাংসাশী যাদের মুখ এবং মাথা শরীরের তুলনায় বেশ বড়।

A) বাংলার চেগা (*Chaca* sp) B) দক্ষিণ আমেরিকার *Cephalosilurus* sp ও C) *Lophosilurus* sp এর আকার প্রায় এক, স্বভাবও বিশেষ তফাত নেই। শিকারের আশায় লুকিয়ে থাকে এরা সবাই।

খাস বাংলার চ্যাকা বা চেগা (*Chaca chaca*, Chacidae), যাদের আত্মীয়রাও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তে থাকে, মিল খুজে পায় দক্ষিণ অ্যামেরিকার Cephalosilurus, Lophisilurus এবং আরও কিছু Pseudopimelodidae গোত্রের মাছের স্বভাব ও চরিত্রে। Siluridae গোত্রের আরেক সদস্য পাবদা বা *Ompok* নিজের মুখের আকারের চেয়ে বড় মাছ গিলে নেওয়ার স্বভাবের জন্যে Auchenipteridae গোত্রের Asterophysus batrachus সাথে একই নামে পরিচিত, Gulper catfish Auchenipteridae গোত্রের Trachycorystes এরও এই গিলে নেওয়া স্বভাব দেখা যায়। আফ্রিকার রিফট লেক গুলি একে অপরের থেকে আলাদা থাকা সত্ত্বেও ওখানকার মাছেদের, বিশেষত সিক্লিডদের দেহের আকৃতি এবং স্বভাব একরকমের হয়ে গেছে। এমনকি আলাদা আলাদা লেকের ভিন্ন মাছেদের রঙের মিল ও পাওয়া যায় (উদাহরন ঃ লেক মালাউইর *Maylandia lombardoi* এবং লেক টাঙ্গান্যিকার *Neolamprologus tretocephalus*)। তা ছাড়া জীবজগতের বিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটাও একবার ঘটেনি, অনেক কোটি বছর ধরে অনেকবার ঘটেছে। সেটা হল মাছের ডাঙ্গায় উঠে আসা, এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও জলের বাইরে বেঁচে থাকা। চতুষ্পদদের পূর্বপুরুষরা ডাঙ্গায় না এলে আজ এই লিখতে পারতাম না, আপনারা পড়তেও পারতেন না। তবুও আজ আমরা এরকমই জলের বাইরে বাঁচতে পারা মাছকে খাই বা পুষি। আমাদের সবার পরিচিত কৈ, সিঙ্গি, মাগুর, গুলে, ল্যাটা, চ্যাং বা শোল এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।মাগুর এবং শোল কেউ খুব কাছের আত্মীয় নয়, তবুও মাছ বাজারে সবচেয়ে বেশি সময় বেঁচে থাকে এরা দুজনেই। লাংফিশ ডাঙ্গাতে শীতঘুম দেয়, এবং mudskipper রা জীবনের অনেকটা অংশই ডাঙ্গায় কাটায়।

বিবর্তনের কথা বলতে শুরু করলে শেষ তো হতেই চায় না, উলটে বিবর্তনের ব্যাপারে জানার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেয়। মনে হয়, যদি পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষুদ্র কোন ব্যাপার অন্যভাবে হত, তাহলে জীবন আজ কিরম হত? প্রত্নতাত্ত্বিক, লেখক, এবং বৈজ্ঞানিক Stephen Jay Gould বলেছিলেন - 'if one could rewind the tape of life [and] the same conditions were encountered again– evolution could take a very different course.' অর্থাৎ সব ঘটনা একভাবে ঘটলেও প্রাণ একভাবে বিবর্তিত হত না। এই বক্তব্য ঠিক না ভুল বলে দেওয়া যায় না, কারণ এই বক্তব্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমান বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তবুও, এই কথা মন কে চঞ্চল করে দেয়, ভাবিয়ে তোলে তাহলে কি হতে পারত? অসংখ্য হয়তো... উঠে আসে। কিন্তু সেই সব হয়তোর মধ্যেও হয়তো আমরা অভিসারী বিবর্তনের দেখা পেতাম। সেই হয়তো পৃথিবীতেও মাংসাশী থাকত, সেখানেও হয়তো মাছ ডাঙ্গাতে উঠে আসতো, এবং সেখানেও হয়েত সালোকসংশ্লেষের জন্য অনেক উপায় তৈরি হত। জুরাসিক পার্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র lan Malcolm -এর কথায়, "Life breaks free. Life expands to new territories. Painfully, perhaps even dangerously. But life finds a way.'

বাংলার *Osteobrama cotio* (ওপরের ছবি) এবং আমেরিকার *Charax* sp (নিচের ছবি) কেউ কাছের আত্মীয় নয়ে। প্রথমজন cyprinid গোত্রের, দ্বিতীয় জন characid গোত্রের।

চিত্র সূত্র - ইন্টারনেট।

।। মাছের জলের TDS এবং Hardness- এর গোড়ার কথা।।

প্রসেনজিৎ খাঁ

পাইরেটস' ডেন গ্রুপে প্রায়ই অনেকের কাছ থেকে এইধরনের প্রশ্ন শোনা যায় যে- জলের TDS নামাবো। কি করে? বা জলের pH ওঠাবো বা কম করবো কিভাবে? বা তর্কবিতর্ক শুরু হয় জলে বাদামপাতা আর ড্রিফ্টউড দিয়ে TDS নামানো যায় কিনা? ইত্যাদি।

আপনাদের মত আমিও শখের মাছপুষিয়ে, অনেক বছর ধরে বেশ কয়েকধরনের মিষ্টি জলের মাছ কাঁচের ট্যাংকে রেখে আসছি। সেই শখের অভিজ্ঞতা থেকে এবং রসায়নের ছাত্র ও কর্মসূত্রেও কিঞ্চিৎ রাসায়নিক গবেষণার সাথে জড়িত থাকার সুবাদে এই বিষয়ে একটু সরাসরি আলোচনা করবো। (আমার ভুলও হতে পারে, আপনারা অবশ্যই সেক্ষেত্রে শুধরে দেবেন বা নতুন তথ্য যোগ করবেন।)

জলের TDS কথার অর্থ সবাই জানেন, Total Dissolved Solid মানে জলে দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ। এই কঠিন পদার্থগুলিকে সাধারণত আমরা salt বা লবন বলি। এখানে "দ্রবীভূত" শব্দটি মাথায় রাখবেন। এর অর্থ হল যেসব কঠিন পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়, যা জলে গুলে যায় তারাই জলের TDS বাড়ায়। আপনি এমন একটি অজৈব লবণ দিলেন যেটি জলে দ্রবীভূতই হয় না, তাহলে সেটা জলের TDS বাড়াবে না। (যেমন ক্যালসিয়াম সালফেট, যেমন বালি বা সিলিকন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি)। খুব সহজে কম সময়ে এই TDS মাপা হয় ডিজিটাল TDS মিটার দিয়ে, এর একক হল parts per million(ppm) বা milligram per liter. ল্যাবরেটরিতে TDS মাপা হয় একটু কষ্ট করে, একটু বেশি সময় লাগে। আচ্ছা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, সেটা হল জলের hardness এর সাথে অবশ্যই TDS জড়িত। কিন্তু hardness ই একমাত্র TDS -এর নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর নয়। এটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে-hardness বেশি হলে সেই জলের TDS ও বেশি হবে কিন্তু উল্টোটা আবার সবসময় হয় না বা সমানুপাতিক হারে হয় না! অর্থাৎ জলের TDS বেশি হলেই যে hardness সেই অনুপাতে বেশি হবে এমনটা নয়। কারণ, জলের Temporary hardness মাপা হয় শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত কার্বনেট ও বাইকার্বনেট লবণের পরিমাণ দিয়ে। জলকে গরম করলে বা ফোটালে সেই জলের temporary hardness কমে যাবে কিন্তু TDS বেড়ে যাবে।। কেন এটা হবে বা এর কারণ বিশদে লিখতে গেলে কেমিস্ট্রি ক্লাস হয়ে যাবে, আপনারা আমায় গাল দেবেন! তাই আর ব্যাখ্যা করলাম না। তবে জলের hardness বা ক্ষারত্ব জিনিসটা আসলে কি এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে পরের অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। মোটকথা, বোঝার সুবিধার্থে এটা ধরে চলুন যে সাধারণত soft water মানে জলের TDS কম এর hard water মানে TDS বেশি।

GH (in dGH)	GH (in ppm)	Water Hardness
0 – 4 dGH	0 – 70 ppm	Very soft
4 – 8 dGH	70 – 140 ppm	Soft
8 – 12 dGH	140 – 210 ppm	Moderately hard
12 – 18 dGH	210 – 320 ppm	Hard
18 – 30 dGH	320 – 530 ppm	Very hard

যাইহোক, TDS সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হল। এবার বলুন কেন জলের TDS আপনি বাড়াতে বা কমাতে চাইছেন? আপনার ট্যাঙ্কের জলের TDS যদি ১৫০ থেকে ২৫০ এমনকি ৩০০-এর কাছাকাছি হয় তো আপনি বেশিরভাগ fresh water species তাতে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, ডিসকাসও রাখতে পারবেন। সাধারণত আমাদের রাজ্যে মিউনিসিপ্যালের সরবরাহ করা জলের TDS ওই ১৫০ থেকে ৩০০-এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। যদি আপনার এলাকায় জলের TDS ৩০০-এর উপরে থাকে তবে দুর্ভাগ্য! ২০০ TDS এর বেশী জল কিন্তু মানুষের পান করাও উচিত নয়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আপনাকে ফিল্টার (mainly RO) দিয়ে জল পরিশোধন করে বা জল কিনে ব্যবহার করতে হতে পারে নয়তো বেশি TDS যেসব মাছের প্রয়োজন সেগুলি পুষতে পারেন। এবার TDS একটু বেশি লাগে কাদের ক্ষেত্রে? সবাই জানেন, প্রধানত আফ্রিকান সিকলিড (এটাই সঠিক উচ্চারণ)। এছাড়াও মলি, সোর্ডটেল, গাপ্পি ইত্যাদি live-bearer এবং কিছু রেনবো প্রজাতি একটু বেশি TDS এর জলে ভালো থাকে। জলের TDS বাড়ানো এমন কিছু কঠিন। কাজ নয় সেটা অনেকেই জানেন এবং করেও থাকেন, তাই ওটা নিয়ে আর লিখলাম না।

এবার বলুন, কম TDS ওয়ালা জলে কোন মাছ থাকে? হ্যাঁ, মজাটা এখানেই বন্ধু! অনেক ছোট-বড় মাছ। যাদের উৎস আমাজনের বিভিন্ন শাখানদী বা উপনদী, যাদের আমরা এতবছর ধরে আমাদের গড়পড়তা TDS এর জলেই রেখে এসেছি তারা আসলে কম TDS এর জলেই থাকে (কোনো কোনো প্রজাতির জলের TDS ৫০-৪০ ppm)। বেশিরভাগ টেট্রা, এঞ্জেল, ডিসকাস, বেশিরভাগ দক্ষিণ আমেরিকার সিকলিড ইত্যাদি। আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশ কিছু রাসবোরা এবং মাইক্রোরাসবোরা, বেশিরভাগ বেটা প্রজাতি, কিছু আফ্রিকান কিলি ফিস কম TDS এর জলে থাকে। এদের পোশাকি নাম blackwater species কিন্তু বছরের পর বছর, দশকের পর দশক বিভিন্ন দেশে এইসব মাছের captive breeding করা হয়েছে। সেইসব দেশের জল-আবহাওয়ায়, স্বাভাবিক TDS এর জলে। ক্রমাগত captive breeding হতে হতে নিজেদের আদি পরিবেশ ও জলের প্যারামিটার থেকে এরা কয়েক লক্ষ প্রজন্ম সরে এসেছে! সুতরাং, এদের আপনি সাধারণ জলেই রাখছেন ভালোভাবেই। এদের রাখার জন্য আপনার জলের TDS কম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কখন আপনার জলের TDS কমাতে হবে? এবার আপনি যদি সেই আদি বাসস্থান থেকে ধরা জংলী মাছটিকেই (যাকে বলে wild caught) পুষতে চান বা তার f1 বা f2 ইত্যাদি প্রজন্ম পুষতে চান তাহলে জলের TDS কম করতে হবে বৈকি। অবশ্য শুধু TDS নয়, pH সহ জলের অন্যান্য প্যারামিটারও যেমন dGH আপনাকে সেই মাছটির বাসস্থানের মত করতে হবেই। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি black water aquarium করতে চান বা কোনো black water biotope করতে চান। তাহলেও কম TDS এর জল ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, black water মানে শুধু কালো রঙের জল বা pH কম করা নয়, জলের TDS ও স্বাভাবিকের থেকে কম রাখতে হয়। জলের dGH এর মানও কম রাখতে হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের যেকোনো blackwater ecosystem এ জলের TDS কম থাকে অর্থাৎ জল হয় soft water এর রাসায়নিক কারণ

হল-জলের TDS কম না হলে সেই জলের pH স্থায়ীভাবে কম হবেই না, হতেই পারে না (আপনি নিজে বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। জলের মধ্যে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ কম না হলে (অর্থাৎ কম TDS আপনি যতই ট্যানিন দিন ,তাৎক্ষণিক pH কমলেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে জলের pH কমবে না। এবারে অসুবিধাটা হল জলের TDS যেমন সহজে বাড়ানো যায় তেমন জলের TDS কিন্তু সহজে কমানো যায় না। কেন যায় না সেটা আমার লেখার প্রথমাংশ ভাল করে পড়লেই বুঝবেন।

* তাহলে জলের TDS কমাবেন কীভাবে?

(১) আপনি বেশি TDS- এর জলকে RO ফিল্টার দিয়ে পরিশোধন করে TDS নামাতে পারেন। ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি। (২) বাজারে যে প্যাকেজড জল পাওয়া যায় যেমন কিনলে,বিসলেরি ইত্যাদি সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণত এগুলির TDS ১০ থেকে ৫০এর মধ্যেই হয়। খুব মারাত্মক কিছু করতে চাইলে Deionised water কিনুন, দাম বেশি এবং TDS হয় ০ থেকে ৫ এর মধ্যে!

(৩) আপনার বেশি TDS- এর জলকে ion exchange resin column এর মধ্য দিয়ে চালনা করুন। দুটো রেসিন স্তম্ভ থাকে, একটি cation exchange এবং একটি anion exchange resin জল থেকে দ্রবীভূত লবণ exchange করে TDS নামিয়ে শূন্যের কাছাকাছি করে দেবে! এটিও ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি। (৫) জলের TDS কিছুটা কমাতে পারবেন পিট মস (peat moss) দিয়ে। তবে পিট মসের ব্যাগ ফিলট্রেশন সিস্টেমে রেখে দিলে কিন্তু হবে না। ভাল পরিমাণে (৪০০ গ্রামের মত) পিট মস বেশ কিছুক্ষণ জলে। ফুটিয়ে নিন, দেখবেন ফোটানার পর ওই মস জলে ডুবে যাবে। এবার ওই মস একটি ছিদ্রযুক্ত ব্যাগের মধ্যে (mesh bag) রেখে যে জলের TDS কমাতে চাইছেন তার মধ্যে দিয়ে দিন এবং চার-পাঁচ দিন একটা ছোট এয়ার পাম্পের সাহায্যে ওই জলে airation করুন। TDS বেশ কিছুটা কমবে। পিট মসের আরো একটি সুবিধা যেহেতু এটি জলে ট্যানিন নি:সরণ করে তাই জলের TDS কমানোর পাশাপাশি জলের pHও কমিয়ে দেবে। তবে একটি কথা মনে রাখবেন- পিট মস কিনলে যেগুলি Aquarium safe সেগুলিই কিনবেন, বাগানের জন্য নার্সারিতে যে পিট মস পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করলে জলে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান মিশতে পারে।। (৪) সস্তায় পুষ্টিকর উপায় হল মোটামুটি দূষণমুক্ত অঞ্চলে অধাতব পাত্রে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করুন। আমি নিজে বৃষ্টির জল ধরে TDS ৬-৭পেয়েছি! একদম ঘিঞ্জি শহরে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করলেও TDS ১৫ থেকে ২০-এর মধ্যেই থাকে।

এতকথা জলের TDS কমানো নিয়ে বললাম তাই TDS বৃদ্ধির উপায় নিয়েও কিছু বলা উচিত। জলের TDS এবং তার সাথেই GH, KH বাড়ানোর সবথেকে ভালো উপায় হল জলে কোরাল চূর্ণ (Crushed Coral)। দেওয়া। অনেকেই ট্যাঙ্গানিকান সিকলিড ট্যাঙ্কে এবং মেরিন ট্যাঙ্কের সাবস্ট্রেটে কোরাল চূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন অন্যান্য পাথর ও বালির সাথে।

এই প্রসঙ্গে জলের TDS-এর সাথে এবং pH- এর সাথে জড়িত আরো দুটি প্যারামিটার নিয়ে একটু বলে রাখা দরকার। সেই দুটি হল KH এবং GH, যাদের অর্থ যথাক্রমে Carbonate Hardness এবং General Hardness ..কার্বোনেট হার্ডনেস বা জলের 'কার্বোনেট ক্ষারত্ব' দিয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ হয় জলের মধ্যে কি পরিমাণে কার্বোনেট (CO_3) অথবা বাইকার্বোনেট (HCO_3) লবণ আছে সেটি। জলের কার্বোনেট ক্ষারত্বকে রসায়নের পরিভাষায় 'ক্ষণস্থায়ী ক্ষারত্ব' (Temporary Hardness)ও বলা হয়। একে পরিমাপ করা হয় dKH বা dH এককের মাধ্যমে (degree Hardness). অপরপক্ষে জেনারেল হার্ডনেস বা জলের 'চিরস্থায়ী খরত্ব' দিয়ে প্রকাশ করা হয় প্রধানত জলের ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম লবণ জনিত ক্ষারত্ব। একে পরিমাপ করা হয় dGH এককের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে যদিও দুটিই জলের ক্ষারত্বকে নির্দেশ করে তবুও জলের KH এবং GH প্যারামিটার দুটি মাপার পদ্ধতি কিন্তু একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। কেন নয়, সেটি আমার লেখাটি পড়ে রসায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবলেই বুঝতে পারবেন। তবে কিছু কিছু লবণ জলে থাকলে সেটি জলের KH ও GH দুটিই বাড়িয়ে দেয়। যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অর্থাৎ $CaCO_3$. এটি জলে থাকলে ক্যালসিয়ামের জন্য GH বৃদ্ধি পায় আবার কার্বোনেটের জন্য KHG বৃদ্ধি পায়। একারণে সমুদ্রের জলে বা মেরিন ট্যাংকে কোরাল চূর্ণ,এরাগোনাইট স্যান্ড, রিফ স্যান্ড ইত্যাদি থাকার জন্য ওই জলের KH ও GH. দুইই বেশি হয়। অনেকটা একই রকম প্যারামিটার দেখা যায় আফ্রিকার লেক ট্যাঙ্গানিকায়। যে কারণে আফ্রিকান সিকলিড প্রজাতির মাছগুলি বেশি KH GH-এর জল পছন্দ করে অর্থাৎ ওদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের জলে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের কার্বোনেট লবণ থাকে। মজার ব্যাপার হল এইধরনের জল আবার যেকোনো ধরনের শামুক ও ঝিনুকের পক্ষে আদর্শ! কারণ, শামুকের এবং ঝিনুকের শক্ত খোলার মূল উপাদানই হল ক্যালসিয়াম। সাধারণত যে জলের KH এবং GH বেশি

সেই জলের TDS ও বেশি হয়,তার সাথে সাথে pHও বেশি হয়। তবে এর ব্যতিক্রম হতেই পারে এবং বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে! যেমন কোনো বিশেষ উৎসের জলের GH এবং TDS বেশি কিন্তু KH কম, তার সাথে pH ও কমের দিকে হতে পারে। সবই নির্ভর করে জলের উৎসের উপর এবং জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন লবণ ও ট্যানিনের উপর। এই নিয়ে আর গভীর আলোচনা করলাম না।

কোনো জলের KH যত বেশি হবে সেই জলের বাফারিং ক্ষমতাও তত বেশি হবে। অর্থাৎ, জলে Acid দিলে জলের pH কমবে না,ক্ষার দিলেও সহজে pH বাড়বে না। চটজলদি pH- এর পতন এবং উত্থান রোধ করার এই ক্ষমতাকেই বাফারিং ক্ষমতা বা buffering capacity of water বলে। জলের বাফারিং ক্ষমতা থাকার অর্থ সেই জলের pH সহ অন্যান্য প্যারামিটার সুস্থিত থাকবে, চট করে ওঠানামা করবে না যা মাছ পোষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলের KH-এর সাথে pH-এর সরাসরি সম্পর্ক আছে। আসলে রসায়নের মুলগত ধারণা অনুযায়ী দেখলে জলে acid দিলে সেই এসিডের সাথে জলে উপস্থিত কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেটের বিক্রিয়া হয়ে যায়,জলের pH নামানোর মত হাইড্রোজেন আয়ন অবশিষ্ট থাকে না।। আর এটা সবাই জানেন- যে জলে যত বেশি পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে, সেটি তত আম্লিক অর্থাৎ সেইজলের pH তত কম। সুতরাং, জলে যত বেশি কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট, তত বেশি তার KH value, তত বেশি সেটা এসিড বা ট্যানিনকে খেয়ে নেয়। তার মানে সোজা কথায় দাঁড়ালো জলের KH যত বেশি তার এসিড (বা ট্যানিন) প্রশমনের ক্ষমতাও তত বেশি। বিভিন্ন গাছ/পাতা/ফল/বীজ থেকে প্রাপ্ত ট্যানিন প্রকৃতপক্ষে মৃদু জৈব এসিড। তাই অজৈব এসিডের (যেমন হাইড্রোক্লোরিক বা নাইট্রিক এসিড) তুলনায় ট্যানিনের pH নামানোর ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কম। মোদ্দা কথা জলের খরত্ব না কমিয়ে। অর্থাৎ KH না কমিয়ে সেই জলের pH কমানোর চেষ্টা করা বৃথা। সেই একই কথা প্রযোজ্য জলের TDS এবং GH- এর ক্ষেত্রেও।

আশা করি বোঝাতে পারলাম যে hard water-এ ট্যানিন যোগ করলেও কেনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে সেই জলের pH নামে না। শুধু তাই নয়, যে জলের KH বেশি (12dH or more), সেই জলের pH সাতের উপরে হয় অর্থাৎ জল ইষৎ ক্ষারীয় হয়। বিভিন্ন বইয়ে,ওয়েবসাইটে এবং গবেষণাপত্রে আমরা কোনো মাছের প্রজাতির আবাসস্থলের জলকে যে soft এবং hard water বলে চিহ্নিত করতে দেখি সেটি প্রধানত GH ও TDS এর ভিত্তিতেই।

বেশি ক্ষারত্বের জল নিয়ে আলোচনা যখন হল তখন কম ক্ষারত্বের জল অর্থাৎ

'মৃদু জল' নিয়ে দুই-এক কথা বলে রাখা উচিত। প্রকৃতিতে 'ব্ল্যাকওয়াটার' বলতে আমরা যা বুঝি সেটি কিন্তু শুধুমাত্র কম pH-এর জল অর্থাৎ আম্লিক জল না। ব্ল্যাকওয়াটার বা কালোজলের সাথে অন্যান্য মিষ্টিজলের (freshwater or white water) মূল পার্থক্য হল জলে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের ঘনত্ব। ব্ল্যাকওয়াটার বাস্তুতন্ত্রের জলে এই ধাতব আয়নগুলির ঘনত্ব অত্যন্ত কম থাকে, তাই ওই জলের GHও কম হয়, TDS ও কম হয়। এর সাথেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার হল conductivity বা তড়িৎপরিবাহিতা। ব্ল্যাকওয়াটার নদী বা জলপ্রপাত বা জলাশয়ের জলের conductivity অত্যন্ত কম হয়। আলোচনা বড় বেশি নিরস ও বৈজ্ঞানিক হয়ে যাবার ভয়ে এই conductivity নিয়ে আর বিশদে কিছু বলছি! আবারো বলছি আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শুধু জলের রঙ আর pH দিয়ে ব্ল্যাকওয়াটারের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় না; ব্ল্যাকওয়াটারের আরো কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার হল dGH– TDS and conductivity. উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমাজনের যে অংশে অল্টাম এঞ্জেল থাকে (Upper and middle orinoco tributaries– Upper Rio Negro) সেই ব্ল্যাকওয়াটার প্রায় স্বচ্ছ, কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়ে তার pH থাকে ৪.৫ থেকে ৫.৫-এর মধ্যে!

যেহেতু ব্ল্যাকওয়াটার বাস্তুতন্ত্রের জলে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদির লবণ খুবই কম পরিমাণে থাকে তাই এই জলে শামুক,ঝিনুক এবং চিংড়িজাতীয় প্রাণী সাধারণত থাকতে পারে না। কারণ, এই প্রাণীগুলির খোলসের মূল উপাদান যে ক্যালসিয়াম সেটা আগেই বলেছি। আশা করি এবার বুঝতে পারছেন কেন। ব্ল্যাকওয়াটার ট্যাংকে শামুক বা শ্রিম্প রাখা উচিত নয়! এদেরকে ব্ল্যাকওয়াটার ট্যাংকে রাখলে হয়তোবা বেঁচে থাকবে কিন্তু ভালো থাকবে না, দুর্বল হয়ে মরে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

** এবার সবথেকে common misconception ঝেড়ে ফেলুন। বাদাম পাতা বা যেকোনো পাতা এবং কোনো ড্রিফ্টউড দিয়ে জলের TDS নামতে পারে না, সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়। আপনার জলের TDS যদি ১০০ এর নিচে থাকে তো কিছু seasoned driftwood or bogwood অনেকদিন জলে ফেলে রাখলে TDS সামান্য নামে, এটুকুই হয়। এমনকি যারা ব্ল্যাকওয়াটার করেছেন বা করবেন বলে ভাবছেন তারাও এটা জেনে রাখুন যে কম TDS-এর জল ব্যবহার না করলে আপনি দীর্ঘমেয়াদি ভাবে জলের pH নামাতে পারবেন না, hard water এ যতই blackwater extract দিন বা ট্যানিন নি:সরণকারী পাতা-বীজবাকল-শিকড় ইত্যাদি দিন তার প্রভাব থাকবে কয়েকদিন বা এক-দুই সপ্তাহ! তারপর আবার জলের pH ৭ এফিরে আসবে (আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিন)। কেন এরকম হয় সেই chemistry আগের অনুচ্ছেদেই বলেছি।

*** সতর্কীকরণ:- Softwater বা কম TDS- এর জল ব্যবহার করলে অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে সেই জলের বাফারিং ক্যাপাসিটি কমে যায়। অর্থাৎ, সামান্য এদিক-ওদিক হলে (তাপমাত্রা) বা জলে বেশি পাতা-কাঠ বা অন্য ট্যানিন পড়লে কিন্তু জলের প্যারামিটার ঝপ করে পাল্টে যায়, হঠাৎ করে pH নেমে যেতে পারে! বৃষ্টির জল বা DI water ব্যবহার করলে এই ঘটনা হয়, কারণ জলের বাফারিং ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়। মাছ মরে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। তাই অত্যন্ত সাবধান, অভিজ্ঞ Aquarist or scaper তাদেরই কৌশলে কম TDS এর জল ব্যবহার করা উচিত, অন্যদের নয়। মনে রাখবেন জলের TDS বেশি মানে তার বাফারিং ক্ষমতা বেশি আর TDS কম মানে তার বাফারিং কম। জলের বাফারিং ক্ষমতা বেশি অর্থে তার প্যারামিটার ঝট করে পাল্টে যাবেনা।

মেছোবই

'মেছোবই' এর চতুর্থ পর্ব রয়েছে আপনার অপেক্ষায়।
মাছেদের নিয়ে আপনার ভালোবাসার গল্প ফুটিয়ে তুলুন
'মেছোবই' এর পরবর্তী সংখ্যায়।
সাথে যদি দিতে চান বিজ্ঞাপন তার জন্যও খোলা 'মেছোবই' এর পাতা।

কি-প্যাডে আঙুল চালান আর দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের অফিসিয়াল মেল আইডি-তে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন নীচের যেকোনো একটি নাম্বারে।
আমাদের অফিসিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস piratesden2017@gmail.com
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ৯৯০৩৫৬৯৯৩৫ ৯৩৩৩১৫০১৭৯

মাছ চিত্র

বাসা বদল

গল্প ও ছবি: অরিত্র ভট্টাচার্য্য

অলঙ্করণ: শ্রীদিপ্ত মান্না

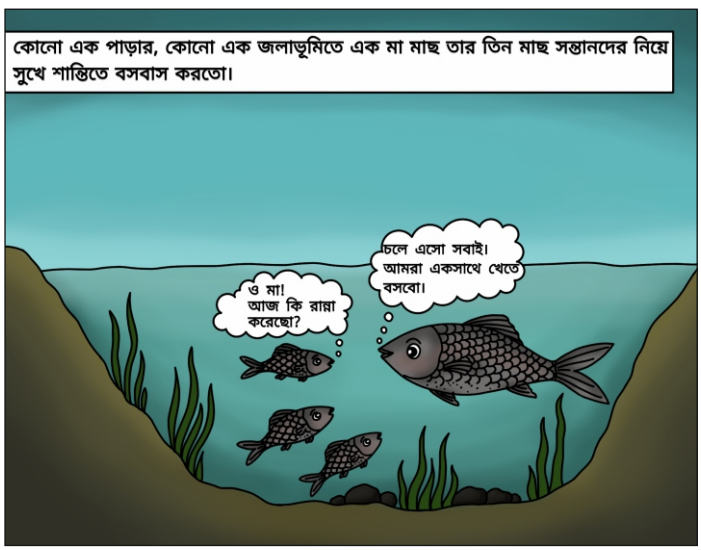

বাসা বদল

Blue Ocean Biofloc

Biofloc & intensive Fish Farming

(অফিস ও ফার্মের ঠিকানা: বসিরহাট, উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- 743411)

আমাদের গাইডেন্সিতে সল্প পরিসরে মাছ চাষ করে স্বনির্ভর হয়ে উঠুন

আমরা প্রজেক্ট প্ল্যানিং থেকে মাছের হারভেস্ট অব্দি সম্পূর্ণ সহায়তা করে থাকি।

এই পদ্ধতিতে শিঙ্গি, মাগুর, পাবদা, কই, ইত্যাদি মাছ ট্যাঙ্কে চাষ সম্ভব যেগুলির উচ্চ বাজারমূল্য বর্তমান

ভারত ছাড়াও নেপাল, বাংলাদেশ ও ফিলিপিন্স এ আমাদের গাইডেন্সী তে কমার্শিয়াল ফিস ফার্মিং প্রজেক্ট চলছে।

আমাদের ফেসবুক পেজ Blue Ocean Biofloc ফলো করুন।

আপনার প্রজেক্ট এর ব্যাপারে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন

Call / WhatsApp: 9830516496

MST

Maharaja Gold

তখনই আসবে চা এর মজা
পান করবেন যখন

মহারাজা

Available on:

Flipkart amazon

shopify meesho

+91-9531736101

www.maharajagoldtea.com

maasindhutraders@gmail.com / maharajagoldtea@gmail.com

।। গাছুয়া গাথা।।

ইন্দ্রনীল মৈত্র

অন্তিম ক্রিটেসিয়াস সময়ে পৃথিবীতে এক খুঁদে বা বামন ডাইনোসরের আবির্ভাব ঘটে যার নাম Troodon, ছোট এই ডাইনোসর আকারে ছোটো হলেও মামাতো বা খুড়তুতো ভাই রাপ্টারদের থেকে কম কিছু ছিল না। শিকার করা হোক কিংবা নতুন প্রজন্মের রক্ষনাবেক্ষণ সবেতেই চোখে পরার মত মিল। ছোটো ছোটো জীব গুলো ঝোপের আড়াল থেকে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়তো শিকারের ওপর। কিন্তু আমাদের মেছো আলোচনায় হঠাৎ প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর কেন? তার কারণ এখানে আজ যাকে নিয়ে আলোচনা, সেই ক্ষুদে দানব উল্কো (*Channa gachua*) ঠিক একই ভাবে Troodon এর পথেরই পথিক। উল্কো বা *Channa gachua* প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে কম-বেশি চোখে পড়ে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এদের বাসস্থান বিস্তার করেছে। মূলত পুকুর, ছোট-বড়ো জলাশয়, প্লাবনভূমি, খাল-বিলে দেখতে পাওয়া যায়। অসাধারণ শিকার দক্ষতা, পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এই মাছকে করে তুলেছে অনবদ্য এক খুঁদে দানব। আর আজ সেই দানব কে চিনে নেবো আমরা। বোঝার চেষ্টা করবো বিদেশী গাল ভরা নামের মনস্টারদের টেক্কা দিয়ে আমাদের এই ছোট্ট উল্কো কেনো জায়গা করে নিল পত্রিকার পাতায়। আমরা যারা ছোট থেকে গ্রাম্য পরিবেশে বড়ো হয়েছি, ফড়িং এর পেছনে দৌড়ে বেড়িয়েছি, গাছে উঠে ফল পেড়েছি কিংবা ঝাপিয়ে পড়েছি গ্রামবাংলার পুকুরে; তাদের কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে বারবার। এমনি কোনো এক বর্ষার সকালে ভেসে যাওয়া ধান জমিতে মশারির জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে চোখে পড়ে গাঢ় নীল রঙের এক ল্যাঠা সদৃশ্য মাছ। লেজের আগা বরাবর উজ্জ্বল লাল রং। ততদিনে মাছ পোষার নেশা পেয়ে বসেছে। মাছটাকে বাড়িতে এনে দেখানোর পর জানলাম মাছটা উল্কো। যদিও জানতে পারি মাছটাকে আগেও দেখেছি, দাদু বাজার থেকে বিশের মাছ আনলে তার সাথেই চলে আসতো। কিন্তু এমন সুন্দর রং আগে আলাদা করে চোখে পরেনি। অন্যান্য "snake head" দের মতোই টর্পেডোসম লম্বাটে গড়ন, মাথা তুলনায় চওড়া আর বড়ো। এক কথায় "*Channa aurantimaculata*" এর বামন সংস্করন। আয়তনে খুব বেশি হলে ১০ থেকে ১১ ইঞ্চি। গায়ের রং গাঢ় কালচে নীল, পৃষ্ঠীয় পাখনায় একটা গোল কালো ফুটকি, লেজ এর প্রান্তীয় ভাগে উজ্জ্বল লাল রং। মূলত এই বৈশিষ্ট্য থেকেই বাকি snake head দের থেকে আলাদা করা যায়। অ্যাকোরিয়ামে কোনো monster fish বা রাক্ষুসে মাছ পুষতে চান? কিন্তু খুব বড়ো জায়গার অভাব? পকেটে টান পরার মত কথা ভাবছেন? সমস্যা কি, একটু আসে পাশে তাকিয়ে দেখুন, খাল-বিল কিংবা পুকুর কোথাও না কোথাও দেখা পেয়ে যাবেন উল্কোর। আর একান্তই যদি না পান তবে মাছ বাজারেশোল, ল্যাঠাদের সাথে পেয়ে যেতেই পারেন। কিন্তু রাখবেন কি করে? প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে এরা কিন্তু ছোটো বলে খুব ছোটো জায়গায় থাকতে পারবে এই ধারনা ভুল। মোটামুটি একটা ৩ থেকে ৪ ফুটের অ্যাকোরিয়ামে এক জোড়া মাছ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। জলের গুনাগুন নিয়ে খুব একটা ভাবার দাকার নেই। খুব কষ্ট সহিষ্ণু মাছ তাই জলের রসায়ন নিয়ে অঙ্ক করার দরকার হবে না, শুধু জল হতে হবে পরিষ্কার। শিকারি মাছ হলেও এনার জন্য চাই লুকোবার পর্যাপ্ত জায়গা। তাই পাথর, কাঠ, কিছু জলজ গাছ আর আলো-আঁধারি পরিবেশ আর তলদেশে নরম বালি ব্যাস! আর কি চাই। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে এরা লাফাতে ওস্তাদ। তাই শক্ত ঢাকনার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাবার নিয়ে খুব একটা ঝামেলা নেই। প্রকৃতিতে চিংড়ি, ছোট মাছ, পোকামাকড় যা পায় তাই নিয়ে পেট ভরে। অ্যাকোরিয়ামে রাখতে চাইলে চিংড়ি, কেঁচো, পেলেট সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু খেয়াল রাখতে হবে খাবার হওয়া চাই পেট ভরা। নাহলে খাবার নিয়ে লড়াই কিংবা সঙ্গে থাকা প্রতিবেশী মাছেদের শান্তির অভাব ঘটে যাবে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান মাছ সেটা আচরনেই বোঝা

যায়। পালক ব্যাক্তিকে খুব সহজেই চিনতে পারে। তাই এনার শিকার পদ্ধতি, খাদ্যগ্রহণ, মালিকের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর একটি দেখার মতো বিষয় সেটা হলো গাছুয়ার প্রজনন আর সন্তান প্রতিপালন। লেখার শুরুতেই Troodon-এর কথা বলেছিলাম। প্রত্নতত্ব বলছে Troodon-রা ছিল খুব সাবধানী আর আদর্শ অভিভাবক, ঠিক তার মাসতুতো ভাই রাপ্টারদের মত। তেমনি গাছুয়া অন্য snake head দের মতোই সন্তান প্রতিপালনে খুব সজাগ। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ মাছেরা গাঢ় রং ধারন করে, তার সাথে শুরু হয় সঙ্গীকে মোহিত করার লড়াই। পুরুষ মাছেদের মধ্যে তুমুল মারপিটের পর যোগ্য পুরুষ তার কাঙ্খিত নারীর কাছে নিজের জায়গা করে নেয়। এই সময় মাছ দম্পতি খুব আগ্রাসী হয়ে ওঠে। অন্য পুরুষ গাছুয়া হোক কিংবা নারী গাছুয়া, কোনো দম্পতির বাসার দিকে যেতে গেলে প্রাণ খোয়ানো অসম্ভব নয়। প্রজনন ঋতুতে এরা এতটাই হিংস্র হয়ে পরে যে নিজের থেকে বড়ো কোনো প্রানীকে আক্রমন করতেও পিছপা হয়না। নারী গাছুয়া ডিম দেওয়া শুরু করলে শুরু হয় এদের প্রজননের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর দর্শনীয় দৃশ্য। গাছুয়া একটি "Mouth Brooder" মাছ, অর্থাৎ পুরুষটি ডিম গুলো কে মুখে পুরে নেয় আর রক্ষা করতে থাকে যতক্ষন না ডিম ফুটে বাচ্চার জন্ম হয়। বাচ্চা গুলো ডিম থেকে বেরোনোর পর ঝাঁকে ঝাঁকে অভিভাবকদের পাশেই ঘুরতে থাকে। একেক বারে কয়েকশ বাচ্চার গাছুয়া দম্পতির এই সন্তান নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য যে কি অসাধারণ সে যে দেখেছে সেই জানে। বাচ্চা গুলো কিছুটা বড়ো হয়ে গেলে মা বাবার আশ্রয় ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। গাছুয়া বা উল্কোর captive breeding সম্ভব ও তুলনায় সহজ। প্রয়োজন মোটামুটি ৩ থেকে ৪ ফুটের একটা জায়গা, কিছু ঝাঁঝি জাতীয় আর ভাসমান গাছ, কিছু ডালপালা। এমন একটি জায়গায় এক জোড়া গাছুয়া ছেড়ে দিন, আর সাথে যোগান দিন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। মদন দেব আর কার্তিক সহায় হলে আর সময় সঠিক হলেই পরিবার বিস্তার শুরু করবে। আর একটা সিজেনে মোটামুটি ২-৩ বার বাচ্চা দিয়ে দেবে। গাছুয়া একটা সময় খুব সহজলভ্য হলেও বর্তমানে কমে আসছে সেই চিরাচরিত কারণে। প্রথমত গাছুয়া ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে চাষ হয়না। ল্যাঠা বা শোলের মত বাঙালির পাতে জায়গা করে উঠতে পারেনি এই মাছ। চাষের জন্য খালের ব্যাবহার কমছে দিনে দিনে, তার সাথে চাষে ব্যাবহৃত রাসায়নিক, পুকুর বা বিলে ব্যাবসা ভিত্তিক মাছ পালন আর পুরনো জলাশয় বুজিয়ে আবাস গড়ে তোলা এইসব কারনই সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে এদের। আর সকল দেশি মাছ যাদের খাদ্য হিসাবে কিংবা ব্যবসায়িক মূল্য কম তাদের সাথেই গাছুয়াও কি হারাতে বসেছে? হয়তো আজ নয়, কিন্তু কাল? কোথায় দেখতে পাবেন এই মনস্টারদের? আরোয়ানা, অস্কার কিংবা অ্যালিগেটর গার তো অনেক হলো, এবার না হয় একটু নিজের দেশের মাটি ঘেটে দেখি কিংবা পুকুরের জলটা নেড়ে দেখি। এদের প্রজননের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। হয়তো আমাদের নতুন প্রজন্ম দেখে যাওয়ার সুযোগ পাবে এদের নিজ চোখে দেখার, Google সার্চ করতে হবে না নিজের পরিবেশ, নিজের মাছ কে জানতে।

NATURE MATES

be nature's mate

"Create your own Butterfly Garden"

Nature Mates Nature Club

6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032

9874357414/9477275731

www.naturematesindia.org

।। পাঁচ ফোঁটা রত্নের সন্ধানে ।।

সৌম্য সরকার

সকাল থেকে অবিরাম ছুটে চলেছে লোকটা, গভীর অরণ্যের আর্দ্র পরিবেশে গায়ের ঘাম জুড়োবার ফুরসত পাচ্ছে না। সেই কখন চেনা এলাকা ছেড়েছে। এবার যেন একটু একটু করে ক্লান্তি ভর করছে ওর শরীরে। অবশ্য এরকম খাটুনি করতে ভালোমতোই অভ্যস্ত ওর পেশীবহুল শরীরটা। এ তো আর কলার ক্ষেতে কাজ করা নয়, যেমনটা ওদের গ্রামের বেশিরভাগ লোকজনই করে থাকে। ওর নাম আকোরা বোম্পে, শিকার করাটাই ওর পেশা। হ্যাঁ ছেলেবেলায় মাঝেমধ্যে কলার ক্ষেতে কাজ করেছে বটে। কিন্তু বাবার থেকে শেখা এই শিকার বিদ্যেটাই ওর আসল পেশা। আকোরা জাতিতে ওশান্তি, ওদের ছোট্ট গ্রাম আসামানে শিকারী হিসেবে ওর বেশ নামডাক। গ্রামের বয়স্করাও আজকাল বলে, হ্যাঁ আকোরা জঙ্গলটা চেনে! আর চেনে বলেই কিনা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হরিণটার পেছনে এতটা দৌড়োনোর সাহস পেয়েছে! জঙ্গল তো আর সামান্য নয়, ওশান্তি মানুষজনরা সাধারণত এই ঘন সবুজ বর্ষাবনকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু আকোরার আজ মাথায় খুন চেপেছে। ওই একফোঁটা হরিণ, যাকে ওরা আদোয়া বলে সে কিনা আকোরা বোম্পের হাত ফস্কে পালাবে! না এ হতে দেওয়া যায় না! আশার কথা ব্যাটা হরিণ জখম হয়েছে। একবার যখন আকোরার ধনুক থেকে বেরোনো তীর ছোট্ট হরিণটাকে ছুঁতে পেরেছে তখন সে শিকার নিয়েই গ্রামে ফিরবে। আর এই নেশাতেই নিজের চেনা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এই ঘন বর্ষাবনের মধ্যে দিয়ে হরিণটাকে ধাওয়া করেছে আকোরা। আর ওই পুঁচকে হরিণটাও এই ঝোপ থেকে ওই ঝোপ ছুটে চলেছে অবিরাম।

কিন্তু এবার থমকে গেছে ও। থমকে গেছে ভূ-ভাগের হঠাৎ পরিবর্তনে। এরকম তো আগে দেখেনি। জঙ্গলটাকে এরকম মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কে? ঠিক যেন হাতের চাপে একটা বিশাল গর্ত তৈরি করেছে এই পৃথিবী যার সৃষ্টি, সেই দেবী আসাসে-ইয়া। কই আসামানের জ্ঞানীগুণী বুড়োগুলোও তো কোনোদিন এই জায়গার কথা বলেনি। সাহস সঞ্চয় করে বিশাল সেই গর্তের ঢালু পাড় ধরে নিচের দিকে নামতে থাকে আকোরা। হরিণটাকে এদিকপানেই আসতে দেখেছে। চারিদিকে প্রাচীন সব মহীরুহ। কি তাদের উচ্চতা! দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। সেসবের মধ্যে আরো দিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে আকোরা। এসে পৌঁছোয় একটা হ্রদের ধারে। সেখানেই নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট হরিণটা, আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেল হ্রদের ধার বরাবর হয়ে থাকা ঘাসের জঙ্গলে। নাকি ওই হ্রদটাই শিকারীর হাত থেকে বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয় দিল হরিণটাকে!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে পড়ে আকোরা বোম্পে। বিশাল বর্ষাবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দেবতার এ কোন লীলাভূমিতে এসে পড়েছে সে। এতো বড় সাধারণ জায়গা নয়। হ্রদের একটা নামও অস্ফুটে বেরিয়ে আসে আকারার মুখ থেকে 'বোসুমতি', হরিণের দেবতা। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সে, বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে এই বোসুমতি হ্রদের ধারে। আসামান গ্রামের বাকি ওশান্তি ভাইদেরও বলবে এ দেবভূমির কথা।

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সাড়ে তিনশো বছর। পশ্চিম আফ্রিকার ছোট্ট দেশ ঘানার দক্ষিণে লেক বোসুমতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ওশান্তি উপজাতির সভ্যতা সংস্কৃতি। তাদের নামানুসারেই গোটা এলাকার নাম হয়েছে 'ওশান্তি রিজিওন', ঘানার ষোলোটি রাজনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনেক অগ্রগতি করেছে। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে আনুমানিক দশ লক্ষ বছর আগে এক উল্কাপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠে এক বিশাল, ১০ কিমি ব্যাসের গর্ত (impact crater) তৈরি হয়। আর তাতেই বৃষ্টির জল জমে প্রায় ৪৯ স্কোয়ার কিমি জায়গা জুড়ে লেক বোসুমতির সৃষ্টি। তবে বসুমতি লেক আজও রয়ে গেছে তার যাবতীয় মহিমা নিয়ে। আজও ওশান্তি জনজাতির মানুষরা বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা ইহলোক ত্যাগের আগে এখানেই শেষ বিদায় জানায় দেবী আসাসে-ইয়াকে। কিছুদিন আগেও ওশান্তি জনজাতির লোকজন পবিত্র বোসুমতি লেকে নৌকা নামাতো না। কাঠের পাটাতনে চড়ে মাছ ধরতো। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় পালটে গেছে অনেক বিশ্বাস। আজ বোসুমতি লেকের ধারে গড়ে উঠেছে রিসর্ট, ছুটি কাটাতে আসা মানুষরা প্রমোদতরীতে সান্ধ্য ভ্রমণ করে লেকের জলে।

কিন্তু আকোরা বোম্পের গল্পকে মান্যতা দিয়ে গবেষকরা বলেন, চিরকাল এমন ছিল না বোসুমতির চেহারা। বরং লেক ছিল গর্তের অনেক নিচে, ছোট পুকুরের মতো, বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি ঢেকে রাখতো ক্রেটারের বেশিরভাগ

অংশ। বরং জল টলটলে লেকের চেহারা হালে হয়েছে। আজও কোথাও কোথাও লেকের জল থেকে মাথা তুলে থাকা শতাধিক বছরের প্রাচীন বৃক্ষের দেহাবশেষ সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

এবার আসি বোসুমতি হ্রদের মাছের গল্পে। কোনোরকম নদী থেকে বিচ্ছিন্ন বোসুমতি হ্রদ আর সেখানে বৃষ্টির জল বয়ে আনা ছোট বড় মিলে প্রায় সাঁইত্রিশটি জলধারা ধরলেও কিন্তু এখানকার মৎস্যবৈচিত্র একরকম হাতেগোনা। মেরেকেটে মোট এগারো প্রজাতির মাছের দেখা মেলে হ্রদের জলে, এদের মধ্যে পাঁচটি সিকলিড পরিবারের। যাদের মধ্যে একটিকে প্রথম বর্ণনা করেন প্রখ্যাত অ্যাকোয়ারিস্ট এবং সিকলিড বিশেষজ্ঞ Dr. Paul V. Loiselle, নাম রাখেন ঘানার মৎস্যবিজ্ঞানী Emmanuel Frempong এর নামে, *Hemichromis frempongi* শুরুতে মনে করা হত *H. frempongi* লেক বোসুমতির এনডেমিক প্রজাতি, মানে সারা বিশ্বে আর কোথাও এর দেখা মেলেনা। যদিও সেই ভুল এখন ভেঙেছে। Frempongi কে আলাদা স্পিসিজ হিসেবে না দেখে, এখন একে *Hemichromis fasciatus* এর লোকাল ভ্যারিয়েশন হিসেবে দেখা হয়; যাদের দেখা মেলে পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। কাছাকাছি চেনা প্রজাতি বলতে রেড জুয়েল ফিশ। Hemichromis জেনাসটা আসলে আগাগোড়া জুয়েলদের জন্যই বরাদ্দ। ইনি কিন্তু রেড জুয়েলদের মতো আগাগোড়া লাল নন। এনার রঙ হলদেটে জলপাই, কিছুটা লম্বাটে চেহারা, বয়সের সাথে সাথে গলা থেকে পেটে উজ্জ্বল লাল রঙ ধরে আর লেজ থেকে বুক পাখনা পর্যন্ত প্রায় সমদূরত্বে পাঁচটা কালো ফোঁটা। ইংরেজি নামও তাই 'ফাইভ-স্পট জুয়েল'। পূর্ণাঙ্গ ফ্রেমপোঙ্গি ছয় ইঞ্চির কম হলেও অ্যাগ্রেশনে অনেক বাঘা বাঘা মাছকে হার মানায়। তাই অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখতে হলে একজোড়ার জন্য অন্তত চারফুটের অ্যাকোয়ারিয়াম আবশ্যিক। মোটামুটি নিউট্রাল pH এর জল এদের পছন্দের, জলে ডুবে থাকা মরা গাছের গুড়ি, শেকড়বাকড়ের খাঁজে-খোঁজে ঘুরতে ভালোবাসে ফ্রেমপোঙ্গি, তাই অ্যাকোয়ারিয়ামের ডেকরেশনও হতে হবে সেই মতো। প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের পছন্দের মেনুর বেশিটাই পূরণ করে ছোট মাছ আর বিভিন্ন জলের পোকামাকড়। অ্যাকোয়ারিয়ামেও খাবার দাবার নিয়ে এদের তেমন সমস্যা নেই, নানারকম ড্রাই ফুডে সহজেই এদের অভ্যস্ত করা যায়। বোসুমতির পাঁচ প্রজাতির সিকলিডের মধ্যে দুই প্রজাতি মাউথ ব্রুডার, মানে মা জন্ম থেকে বাচ্চাকে বড় করে নিজেদের মুখের মধ্যে রেখে। আর বাকি তিনটি সাবস্ট্রেট স্পনার। আমাদের লালপেট ফ্রেমপোঙ্গি এই দ্বিতীয় দলের সদস্য। শুকনো ডালপালার আলোছায়ায় এরা সঙ্গীর সাথে জোড় বাধে। সাবস্ট্রেটে অগভীর গর্ত করে ডিম পাড়ে। বাচ্চাকাচ্চার দেখভালের দায়িত্বভার বাবা-মা দুজনেই ভাগাভাগি করে সামলায়। পছন্দসই সঙ্গী আর যথাযথ পরিবেশ পেলে অ্যাকোয়ারিয়ামে সহজেই ছানাপোনা দেয় ফ্রেমপোঙ্গি।

কাঁচবাক্সে ফ্রেমপোঙ্গি রাখলে জলের উষ্ণতার খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য। এদের আবাসভূমি নিরক্ষীয় অঞ্চলে হওয়ায় সারা বছর জলের তাপমাত্রা মোটামুটি ২৪°- ২৮° সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তাই হঠাৎই টেম্পারেচার পড়ে গেলে এদের যথেষ্ট ধকল সহ্য করতে হয়। সেটা যে শুধুই শীতকালে তা নয়, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে পারদ নেমে যাওয়াটাও এদের না পসন্দ। তাই ফ্রেমপোঙ্গি করতে হলে থার্মোস্ট্যাট একরকম বাধ্যতামূলক। আর যে জিনিসটা খেয়াল রেখে চলতে হয় জুয়েল গ্রুপের মাছ করতে হলে সেটা হল এদের মেজাজ। স্পিসিজ অনলি ট্যাঙ্কই প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত সফলভাবে ফ্রেমপোঙ্গি করতে চাইলে। অন্য প্রজাতির দ্বিগুণ সাইজের মাছকেও ধুনে দেওয়া এদের জন্য ভীষণ স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তাই বড় ট্যাঙ্কে একজোড়া, বা খুব বড়ো ট্যাঙ্কে দুইজোড়া ফ্রেমপোঙ্গি করলে তবেই পুরো নম্বর পাবার সম্ভাবনা।

কিন্তু ফ্রেমপোঙ্গির আবাসভূমি লেক বোসুমতি আজ ভালো নেই। ক্রমাগত বাড়তে থাকা মানুষজনের চাপে আজ কিছুটা সমস্যায় হ্রদের জীববৈচিত্র্য। তিরিশটা গ্রামের প্রায় সত্তর হাজারের কাছাকাছি মানুষের বাস লেকের আসেপাশে। যাদের প্রধান জীবিকা চাষবাস আর মাছধরা। আর এই সমস্থ মানুষজনের জীবনধারণ হ্রদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল যে UNESCO লেক বোসুমতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের। অনেকটা আমাদের সুন্দরবনের মতো। কিন্তু লেকের আসপাশে ক্রমবর্ধমান কোকো চাষের ফার্ম থেকে লেকের জলে মেশা রাসায়নিক কীটনাশকে, লেকের আসপাশের জঙ্গলে অবাধ পশুচারণে শঙ্কায় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের জীবকূল। লেকের আসপাশে গড়ে ওঠা একের পর এক রিসর্ট হয়তো ওশান্তি লোকজনের কিছুটা কর্মসংস্থান করেছে, দিয়েছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। কিন্তু লেকের ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় ভূমিক্ষয় বেড়ে গেছে অনেকটাই। অতিরিক্ত মাছধরা আরেক সমস্যা। যে অফুরান মৎস্য সম্পদ একসময় ওশান্তি জনজাতিকে উৎসাহিত করেছিল লেকের পাশে বসতি স্থাপন করতে, সেই ভাঁড়ারে আজ টান পড়েছে। চোখে পড়ার মতো কমে গেছে লেক বোসুমতির মাছ। আশার কথা আঞ্চলিক তথা ঘানার প্রশাসন সমস্যাটা অনুধাবন করেছে এবং সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছে। শুরু হয়েছে বোসুমতির ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় নতুন করে বৃক্ষরোপণ। সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ওশান্তি মানুষজনও। আশা করাই যায় শুধুমাত্র কাঁচের বাক্সেই নয় লাল পেটের ফ্রেমপোঙ্গিরা বেঁচে থাকবে তাদের নিজস্ব অনন্য আবাসভূমিতে। ওশান্তি মানুষজন আরো কয়েকশো বছর ধরে শোনাবে লেক বোসুমতি আর আকোরা বোম্পের গল্প।

।। পাঠকের মেছো স্মৃতি ।।

ক) সিস্টোসারকা গ্রিগেরিয়া - বিদিশা ভট্টাচার্য্য

আমি বেকার মানুষ। চাকরি-বাকরি আমার বিরাগভাজন হয়েছেন অনেকদিন ধরে, এখন আমি অবসর কাটাই, বাড়ির কাজ করে আর খুচরো শখ মিটিয়ে।। যে সময়ের কথা লিখছি, তখন বাড়িতে দুটি সারমেয়, দুটিই Whippet, যারা প্রায় কথাই বলে না, মানে ডাকে না, কিন্তু মানুষজনকে অসাবধান দেখলেই দুষ্টুমি করে। তা সে শখের গাছ কাটা থেকে শুরু করে অনেক অনেক কিছুই। বাকিগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য। কেজো লোক বাড়িতে বন্দী থাকলে মুহূর্তে মুহূর্তে মাথার পোকা নড়েচড়ে তাদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে ওঠে, আমারও হলো সেই দশা। টিভি দেখায় বিতৃষ্ণা অনেকদিন থেকেই। ফলে বাড়ির প্রায় চল্লিশ শতাংশ জিনিসপত্র বাতিল হল। কিছুটা হাঁফ ছাড়ার জায়গা পাওয়া গেল। মাথার পোকা বলল, একটা ছোটখাট অ্যাকোয়ারিয়াম হলে মন্দ হয় না। আমাদের আবার 'উঠল বাই তো ...' প্রায় মহার্ঘ জিনিসপত্র সব চলে এল, তাঁরা আবার স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েও গেলেন। এবার নাটকের কুশীলবদের প্রবেশের পালা। কুশীলব পছন্দ করতে গিয়ে দেখলাম, বাইরে যাই-ই বলি না কেন, অভ্যন্তরীণ নারীসত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। মাছ কিনতে গিয়ে দোকান আর হাটে চক্কর কাটা দেখে চৈত্র সেলের কথা মনে পড়তে লাগল। শেষমেষ মনস্থির করে একজোড়া archer fish তীরন্দাজ মাছ গৃহপ্রবেশ করলেন। বেশ চলছিল। তার একটি মাস কয়েক পরে আমার যত্ন আর নিতে পারল না। অন্যটা আমার যত্নের অত্যাচারে সম্ভবতঃ মরিয়া হয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, আমাদের বাড়ির পুঁচকে পুপু তাকে ধরেই চিবিয়ে দিল। অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে নিঃশব্দে পড়ে থাকতে দেখে বেশ কষ্ট হল। গাছগুলোও আছে বেশ। একঝাঁক সারপে টেট্রা ছাড়লাম। মাস দুয়েক পরে আমার এক ভাইপো এসে তার সব মাছ মরে গেছে বলে এমন কাঁদতে লাগল যে তাকে শান্ত করার জন্য এদের দিয়েই ওর অ্যাকোয়ারিয়ামটা সাজিয়ে দিলাম। অ্যাকোয়ারিয়াম আবার স্থাণুবৎ বসে রইল। এর কিছুদিন পরেই সারা পৃথিবীরই প্রায় অবসর যাপনের সময় এসে গেল। তখন অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে দেখলে মনে হত সে মনের দুঃখে বনে যাবার পরিকল্পনা করছে। তখন প্রথম লকডাউন একটু একটু শিথিল হতে শুরু করেছে সবে। সব কিছু সাজিয়ে, জল তৈরী করে মামাকে বললাম,'আপু তুমি তো ওই রাস্তা দিয়েই যাবে! সি আই টি রোডের Fancy Fish Store এ গিয়ে দেখবে Severum Cichlid পাওয়া যায় কিনা?' আগের সপ্তাহে দেখেছিলাম। ওরা দাম বলেছিল দেড়শ টাকা করে। যদি পাওয়া যায় ফেরার পথে একজোড়া মাছ এনো বলে Whatsapp করে এদের নাম লিখেও দিলাম। আমার মামা, যাটোর্দ্ধ মানুষ, কিন্তু কাউকে জ্বালাতন করার কোনো সুযোগ কখনই ছাড়তে রাজী নন। মামা ফেরার পথে ওই দোকানে গিয়ে বাইরে থাকা একজন ভদ্রলোককে বললেন, "এখানে *সিস্টোসারকা গ্রিগেরিয়া*, মাছটা পাওয়া যায়?' প্রসঙ্গতঃ, *সিস্টোসারকা গ্রিগেরিয়া* হল পঙ্গপালের বিজ্ঞানসম্মত নাম। মামা ছোটবেলায় ঘনাদার ভক্ত ছিলেন। নামটা ওখান থেকেই নেওয়া। লোকটা নাম শুনেই দুবার খাবি খেয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে, 'সে আবার কি মাছ?' মামা তখন গম্ভীর মুখে ফোন বের করে ফোন থেকে নামটা দেখিয়ে দিলেন। লোকটা ডবল ভির্মি খেয়ে জানতে চাইল, 'এটা কি চারাপোনা?' মামাকে তখন আর পায় কে! বললেন, 'মশাই চারাপোনা তো বাজারে পাওয়া যায়। ওগুলোকে কি কেউ শখ করে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখে?' ভদ্রলোকটি ভীষণ রেগে ছিটকে গিয়ে বললেন, 'না না মশাই, এসব মাছ আমরা রাখি না।' মামা মুচকি হেসে বাড়ি চলে এলেন। আমি মাছের জন্য বসে আছি। 'মাছ কই আপু?' সে গুড়ে বালি। ওরা সিস্টোসারকা গ্রিগেরিয়ার নামই শোনেনি জীবনে। কি ইইইই আশ্চর্য। ওটা ওরা কেন, আমিও কস্মিনকালে শুনিনি। ওটা আবার কি মাছ? আমি তো। বলেছিলাম সেভেরাম আনতে। 'তুই ঘনাদা ভুলে গেছিস? ঘনাদায়...'। 'জ্বালিও না আপু। তোমাকে ঘনাদা বই থেকে বেরিয়ে এসে মাছ আনতে বলেছিলেন নাকি? মাছ তো আমি চেয়েছি।' 'শোন না, ওরা বলেছে ওই মাছটা নেই। আমি তোর লেখাটাও দেখিয়েছিলাম।' 'নেই বললেই হল? আমি দেখেছি আছে, অনেকগুলো। দুদিনে এতগুলো মাছ সব বিক্রী হয়ে গেল?' 'কি করে বলব বল, বলল কিন্তু আমাকে, ওটা নেই।' -'বলবে না? যা ভড়কে দিয়েছ! সেই আমাকেই দেখতে হবে।' 'হ্যাঁ, তোর জিনিস, তুইই দ্যাখ।' তার পরেরদিন ওই দোকান থেকেই এই একজোড়া সেভেরাম কেনা হল।

খ) নস্ট্যালজিয়া - তথ্যপ্রিয় দাস

আমার জন্ম বেলে তে। ছোটো একটা গ্রাম। অল্প বয়স থেকেই আমি মাছ পুষতাম। গ্রামের বাড়িতে আমার একটা প্লাস্টিকের কৌটো ছিল। খলসে, ল্যাটা, শিঙ্গি মাছের বাচ্চা, যখন যা পেতাম কৌটোয় পুরে দিতাম। খাবার বলতে দিতাম - ভাত আর আটার দলা। তখন আমার বয়স তিন কি চার বছর। ফলে সেইসব মাছের অকালেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটতো। মাছ পোষাটা আমার মধ্যে কোথাথেকে এসেছে তা ঠিক জানিনা। ঠাকুমার কাছে শুনেছি, তার বাবার পুকুরে মাছ পোষার শখ ছিল, ছিল ময়না পাখিও।।

যাইহোক, ১৯৯৪ সালে আমরা চাকদা চলে আসি। তখনও আমি সেই কৌটো তেই মাছ পুষতাম। ক্লাস ৮ এ ওঠার পর আমার বাবা চাকদার অ্যাকুয়ারিয়ামের দোকান থেকে একটা ১৮-১০-১০ ইঞ্চি সাইজের অ্যাকুয়ারিয়াম কিনে দেন। অ্যাকুয়ারিয়াম এর ঢাকনা ছিল টিনের। সাথে দুই প্যাকেট পাথর কিনেছিলাম- লাল আর সাদা। দোকানদার দাদা এর সাথে দুই বোতল ওষুধ দিয়েছিলেন-নীল আর সাদা। ওতে নাকি জল পরিষ্কার থাকবে।

তখনকার দিনে আমার মতো ছোটদের চাকদা বাজারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওই দোকানের ৩ ফুট লম্বা গোল্ড ফিশ এর অ্যাকুয়ারিয়াম। সোনালী রঙের গোল্ড ফিশ গুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। বাজারের ওই দোকানের সামনে দিয়ে গেলেই আমি বাবা বা মা এর হাত ধরে টেনে ওই দোকানে নিয়ে যেতাম। এই অ্যাকুয়ারিয়াম টা আনার পর ও আমার মাছ পোষার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ওই ট্যাংকটা তেও আমি ট্যাংরা, তেলাপিয়া, কই, মাগুর ইত্যাদি মাছ ছেড়ে দিতাম। মাসে ১ বার করে জল পাল্টাতাম। স্কচব্রাইট দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করায় কাঁচে দাগ পড়ে গিয়েছিল। পাথরগুলো সার্ফ দিয়ে ধুতাম। ফলে প্রতিবার জল পাল্টানোর পরে কোনো না কোনো মাছ মরে যেত। এইভাবেই কাটছিল দিন গুলো।

এর পর মাধ্যমিক দিলাম, উচ্চমাধ্যমিক দিলাম - পড়াশুনার চাপে মাছ পোষা বন্ধ হয়ে গেলো। অ্যাকুয়ারিয়াম তুলে রাখলাম। কলকাতা তে হোস্টেল এ চলে এলাম। আমার কলেজ শিয়ালদাতেই ছিল। Dr. R Ahmed Dental College and Hospital আর হোস্টেল ছিল লিন্টন স্ট্রিট এ। হোস্টেল এ আমার প্রাণের বন্ধু ছিল সুদীপ্ত ঘোষ। একদিন ওর কাছে গল্প শুনলাম যে ও বাড়িতে একটা বেশ বড়ো অ্যাকুয়ারিয়াম করেছে। আর ওর মা - বাবা মাছেদের খেতে দেওয়া থেকে শুরু করে জল পাল্টানো, সব দেখাশুনা

করে। একদিন ও আমাকে CIT রোড এর একটা অ্যাকুয়ারিয়ামের দোকানে নিয়ে গেলো। ওর কিছু মাছের খাবার আর ফিল্টার কেনার ছিল। তখনও আমি মাছেদের যে ফিল্টার লাগে, তাও জানতাম না। মাছ পোষার কোনো বেসিক ধারণাই আমার ছিল না। ওইদিন দোকানটায় আমি প্রথম দেখেছিলাম ফ্লাওয়ার হর্ন। কি হিংস্র মাছ টা। আঙুল নাড়লেই কামড়াতে আসে। ওই দোকানের উল্টো দিকে আরও একটা বেশ সাজানো গোছানো বড়ো মাছের দোকান ছিল যেটায় একটা বড়ো জার্ডিনি আরোয়ানা ছিল তখন। দাম শুনে তো আমার হার্ট ফেল করার অবস্থা হয়েছিল। এইসব দেখে আমার মনে আবার একটা অ্যাকুয়ারামিের ইচ্ছা জেগে ওঠে। ক্রমে আমি সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেলাম। বাড়ির সম্মতি তখনও ছিল না। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা জেদ চেপে গেল। আমি আস্তে আস্তে টাকা জমাতে থাকলাম। শীতকাল, আমাদের কলেজে ফেস্ট চলছে তখন। সবাই কলেজে অনুষ্ঠান শুনতে গিয়েছে। আমি মনের মধ্যে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে গেলাম সেই সাজানো গোছানো মাছের দোকানটায়। কিনলাম ১.৫ ফুট ১০ ইঞ্চি -১০ ইঞ্চি সাইজের কালো টপ দিয়ে একটা অ্যাকুয়ারিয়াম। কিনে এনে ভয়ে ভয়ে খাটের তলায় রেখে দিলাম ওটা। ভয়ে বাড়ি তে তো বলতেই পারিনি, শুধু রুমমেট রা আর সুদীপ্ত জানত। বেশ কদিন কেটে গেলো। একদিন সুদীপ্ত এসে বললো - চল মাছ কিনবি। আমি তো মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বেশি টাকাও ছিলনা আমার কাছে। তখনকার দিনে খুব অল্পই হাত খরচ দেওয়া হতো। ও বললো টাকা নিয়ে চিন্তা না করতে। আমাদের সাথে আমাদের অন্যান্য বন্ধু -বিশ্বজ্যোতি, বীরেন, প্রদীপ, গোপাল, গুছাইত এরাও সবাই গেলো মাছ কিনতে। সে এক অদ্ভুত উত্তেজনা। হোস্টেল এ প্রথম অ্যাকুয়ারিয়াম আসছে। ওদিকে একটু ভয় ও করছে। হোস্টেল সুপার না ডেকে পাঠান। আমরা বন্ধুরা মিলে গেলাম অ্যাকুয়ারিয়ামের দোকানে। আমাদের মধ্যে সুদীপ্ত হলো মাছবিশেষজ্ঞ। এক এক জন, এক এক রকম মাছ পছন্দ করলেও, সুদীপ্তর অনুমতি ছাড়া কোনোটাই কেনা হবে না। সমস্ত দোকান ঘেঁটে আমরা দুটো ছোটো এঞ্জেল, একটা ফাইটার, দুটো ব্লু জেব্রা সিকলিড কিনলাম। সুদীপ্ত উল্টো দিকের দোকান টা থেকে একটা মাঝারি সাইজের এঞ্জেল নিয়ে এলো। একটা স্পঞ্জ ফিল্টার আর একটা এয়ার মোটর ও কিনেছিলাম। এসব কেনার টাকা বেশিরভাগটাই সুদীপ্ত দিয়েছিল। হোস্টেল এ অ্যাকুয়ারিয়াম নিয়ে রুম এ ঢোকার পর হোস্টেল এর দাদারা - গুলু দা, সায়ন্তন দা, অর্ক দা, ইমরান দা অনেকে দেখতে আসলো, ক্যান্টিন এর স্টাফ ও রাঁধুনি - নান্টু দা, বংশী দা, দিলীপদা রাও দেখে গেলো। এরপর মাছ ছাড়ার পালা। সুদীপ্তর মনে হলো যে মাছের দোকানের জল ভালো নয়।। ওইসব পচা জল থেকে মাছের ইনফেকশন হতে পারে। তাই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার। ঘরে অন্যান্য দের সাথে আলোচনা করে ঠিক হলো ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ই দেওয়া ঠিক হবে, তাতে সব রকম ব্যাক্টেরিয়া ই মরে যাবে। ডক্সিসাইক্লিন এর ২ টো ট্যাবলেট গুলে দেওয়া হলো। ফল স্বরূপ যা হলো - ট্যাংক পুরো ফেনায় ভর্তি হয়ে গেলো, জল হলুদ হয়ে গেলো। মাছ আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায়না। আমি ব্যাপার টা বললাম। সুদীপ্ত বললো পরের দিন সব ঠিক হয়ে যাবে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফেনা ট্যাংক থেকে উপচে পড়ছে। আমি কিছুটা জল পাল্টে কলেজে চলে গেলাম। কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। তখন পুরো জলটাই আমি পাল্টে দিলাম।। এইভাবে হোস্টেল এ আমার মাছ পোষা শুরু হয়ে গেলো। আমার দেখাদেখি সুদীপ্ত, অর্ণব, অর্কদা, ইমরান দা রাও পরে অ্যাকুয়ারিয়াম কিনেছিল। আমাকে জন্মদিনে সুমন আবার একজোড়া পার্ল এঞ্জেল গিফট করেছিল। এরপর আমার মনে হলো যে একটা অ্যাকুয়ারিয়ামে আমার ঠিক হচ্ছে না। গালিফ গিয়ে আমি আর সুদীপ্ত আরও একটা অ্যাকুয়ারিয়াম কিনে আনলাম। কিন্তু জল ঢালার পর গালিফ এর আসল অবস্থাবেরিয়ে এলো। ৩/৪ জায়গা দিয়ে জল লীক করছিল। দোকানে দিয়ে নতুন করে পেস্টিং করতে হলো। এই সময় আমি কলেজ থেকে ফেরার সময় প্রায়ই আনন্দপালিত নেমে যেতাম আর ওই দুটো মাছের দোকানে ঢুঁ মারতাম। একদিন সাজানো দোকানটায় একটা মাছ চোখে পড়লো। নাম জানিয়েছিল পিরানহা। সেই থেকে আমার মাথায় পিরানহা ঢুকে গেলো। সারাদিন আমার মাথায় পিরানহা ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেক গল্পে ভয়ঙ্কর পিরানহার কথা শুনেছি। যাইহোক মাছটা এনে সবাইকে চমকে দেওয়ার একটা প্ল্যান আমার ছিল।। কিছুদিন পরে মাছটা আমি কিনি অবশেষে। মাছটা কিনে নতুন অ্যাকুয়ারিয়ামটায় ছেড়ে দিলাম। পিরানহা শিকারী মাছ। দুটো মলি ও এনেছিলাম শিকার দেখার জন্য। মলি ছেড়ে দিয়ে আমরা অধীর আগ্রহে মাছের সামনে বসে থাকলাম কখন খাবে। ওদিকে মাছটার কোনো হেলদোল নেই।। পরদিন সকালেও দেখলাম মলি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুদীপ্তর কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ও কিছুটা পেলেট খেতে দিল মলি দের। দেখে অবাক হলাম যে মলিদের সাথে পিরানহাও পিলেট খাচ্ছে। আর কোনো সন্দেহ নেই, দোকানদার পাকু গছিয়ে দিয়েছে পিরানহা বলে। মাছ নিয়ে দোকানে ছুটলাম। অনেক ঝগড়া করার পর দোকানদার টাকা ফেরত দিলনা, ওই টাকায় মাত্র দুটো জুয়েল সিকলিড দিয়েছিল। পিরানহার ভূত কিন্তু সহজে আমার নামেনি। গালিফ থেকে এর পর আরও তিনবার পিরানহা ভেবে পাকু কিনে ছিলাম এবং এতবার ঠকার ফলে হোস্টেল এ আমার ডাকনাম ই পাকু হয়ে গেলো। সহপাঠীরা আর দাদারা পাকু বলে ডাকতো, জুনিয়র রা মাছ দাদা, পাকু দাদা এইসব নামে ডাকতো। পরবর্তী কালে অরিজিনাল পিরানহা, ফ্লাওয়ার হর্ন, গার, সিলভার আরওয়ানা ইত্যাদি পুষেছি হোস্টেলে। সুদীপ্তর হতে পিরানহা একবার ভালোমতো কামড়ে দিয়েছিল। কলেজের স্যাররা জানতে পেরে হোস্টেল এ পিরানহা দেখতে এসে ছিলেন। আমি আর সুদীপ্তমিলে তিন ফুটের একটা অ্যাকুয়ারিয়াম বানিয়েছিলাম। বড়ো মাছ গুলো ঐটাতে থাকতো। এছাড়া ২ ফুট এর ২ টো ট্যাংক আর ১৪/১৫ টা ছোটো ট্যাংক ছিল ২ জনের মিলে। আমরা বই এর তাকে, টেবিল এ, খাটের নিচে সব জায়গাতেই অ্যাকুয়ারিয়াম রাখতাম। কোথাও বেড়াতে গেলে সেখান থেকে পাথর, শুকনো ডাল যা পেতাম, নিয়ে এসে অ্যাকুয়ারিয়াম সাজাতাম।। আমরা কয়েক বার সেমি প্ল্যান্টেড টাইপের অ্যাকুয়ারিয়াম ও বানানোর চেষ্টা করেছি। গালিফ এ যেসব গাছ পাওয়া যেত, কিনে এনে বালিতে পুঁতে দিতাম। চক আর HCL দিয়ে ডাই CO_2 বানাতাম।কিন্তু লাইট আর সার সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকায়, কিছুদিন পর ই পাতা হলুদ হয়ে যেত। তাছাড়া অনেকসময় গালিফ এর কিছু দোকানদার ভুলভাল গাছ ও গছিয়ে দিতো। হোস্টেল এ যে মাছটা আমার সবথেকে বেশিদিন ছিল, সেটা হলো একটা সিলভার আরোয়ানা। লাইভ ফিডিং করতো মাছটা। ইন্টার্ন হওয়ার পর থেকে আমরা স্ট্রাইপেন্ড পেতাম। তখন আমি আর সুদীপ্ত কিছু ডিসকাস কিনি। কিন্তু গালিফ এর কেঁচো রোজ খাওয়ানোর ফলে মাছ গুলো মাঝে মাঝেই পেটের সমস্যায় ভুগতো। তাছাড়া এরা যে সফট ওয়াটার এ থেকে, জল নিয়মিত পাল্টানো দরকার, ডিওয়ার্ম করানো দরকার হয় - এসব না জানায় বছর দেড়েক এর মধ্যেই সব ডিসকাস মারা যায়। হাউস স্টাফ হওয়ার পর আমি হোস্টেল ছেড়ে দিই। ভাড়া বাড়িতে ওই তিন ফুটের অ্যাকুয়ারিয়াম টা নিয়ে যাই। বাকি ট্যাংক গুলোর কিছু কিছু জুনিয়ররা নিয়ে ছিল। ভাড়া বাড়ির ওই অ্যাকুয়ারিয়াম এ একটা জার্ডিনী আরোয়ানা ছিল। পড়াশুনা শেষে বাড়ি ফেরার সময় আমার সাথী ছিল ওই গোল্ডেন পার্ল আরোয়ানা।। গতবছর লক ডাউন এর সময় অনেক দিন বাড়ি ছিলাম না। তখন মাছটা মারা যায়। ৬ বছর এর ও বেশি সময় ও আমার সাথে ছিল। আপাতত বাড়িতে অল্প কিছু অ্যাকুয়ারিয়াম করেছি। যতদিন যাচ্ছে নিজেকে আপডেটেড করার চেষ্টা করছি। তবে এখন অনেক হেল্প পাই এই ‘পাইরেটস ডেন’ গ্রুপ থেকে। গুগল থেকেও পড়াশুনা করে নিই মাছ কেনার আগে। ফলে মাছের মৃত্যুর হারটা অনেকটা কমাতে পেরেছি।

Fireglow

MADE IN INDIA

21 WATTS | 6500K

AQUARIUM LIGHTING

REDEFINED

SHARE YOUR FEEDBACK AT

fireglowlighting@gmail.com